

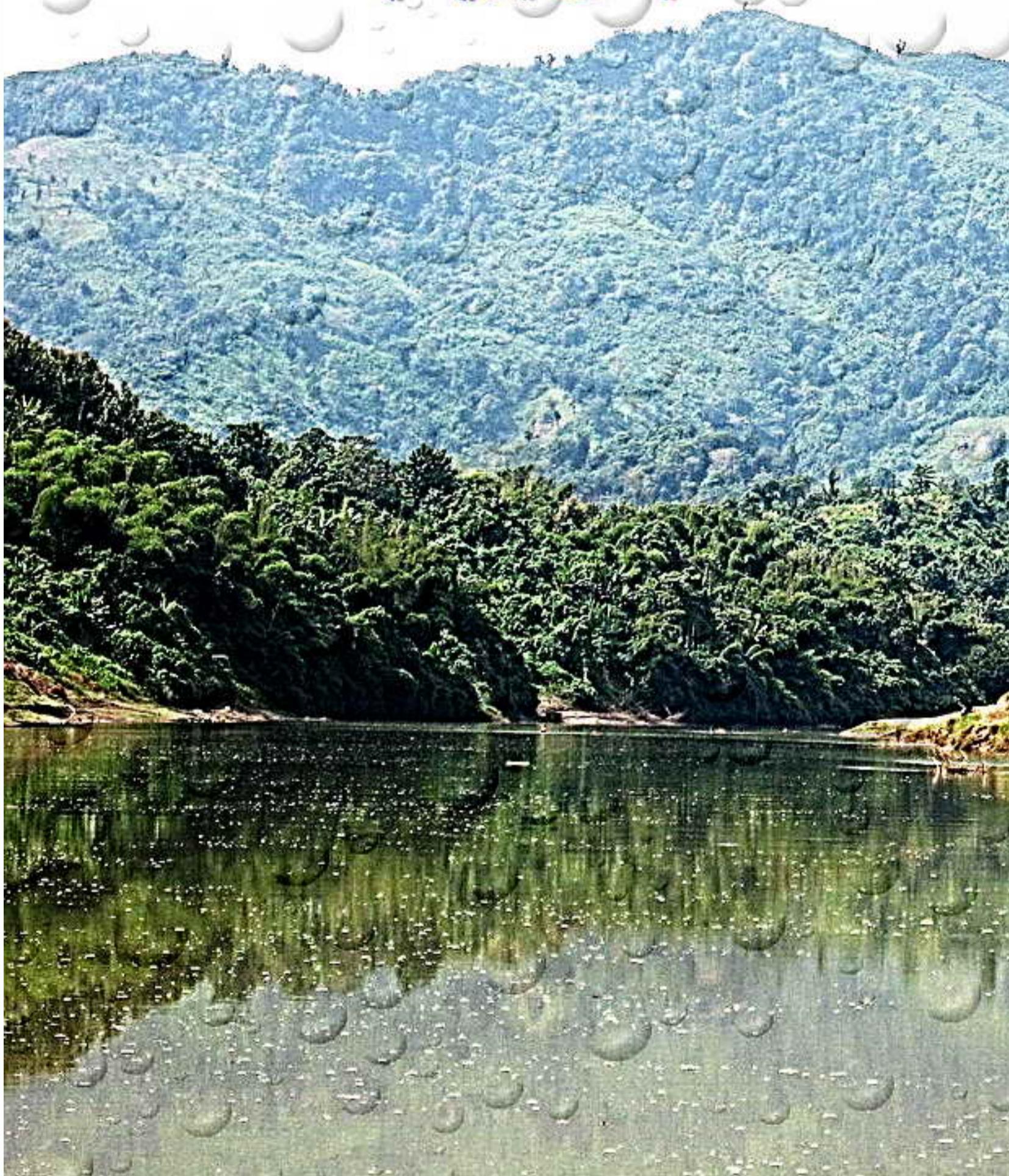
## **T-Rax Er Sondhane by Md. Jafar Iqbal**



**For More Books & Music Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)**  
**MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>**  
[suman\\_ahm@yahoo.com](mailto:suman_ahm@yahoo.com)

মুহসিন জাফর ইকবাল

টি-রেক্ষ এর  
সর্কানে



# মূর্চনা

[www.murchona.com](http://www.murchona.com)

## বইটি মূর্চনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos

suman\_ahm@yahoo.com

### ১. আমাদের বাসা

মালিবাগের মোড়ে যে নতুন চারের দোকানটা খুলেছে, তার ডান পাশের রাস্তাটা ধরে গিয়ে প্রথম গলিটার সামনে যে ময়লা দোতলা দালানটি চোখে পড়ে সেটা আমাদের বাসা। আমাদের মানে ঠিক আমাদের না, আমার চাচাদের। আমার চাচারা হয় ভাই। তার মাঝে চারজন এখানে থাকেন। যে দুজন থাকেন না তার একজন আমার বাবা। বাবার থাকার কোন উপায় নেই, কারণ বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। আমি যখন মায়ের পেটে, তখন বাবা একটা ক্রেনের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ক্রেনের মাঝে চোট লেগেছিল। দুই দিন হাসপাতালে থেকে মরে গেলেন। আমার জন্মের বছরে বাবা মারা গেছেন বলে আমাকে ধরা হয় অপরা। শুনলে মনে দুঃখ পাব বলে কেউ সোজাসুজি বলে না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। তবু দিনে কয়েকবার করে আমাকে শুনতে হয়। আমি অবশ্যি দুঃখ টুংখ পাই না। বাবা মারা যাবার পর আমার মা একটু অন্য রকম হয়ে গেছেন। অন্যেরা বলে মাথা খারাপের মত, কিন্তু সেটা সত্য নয়। দিনরাত শুধু মোটা মোটা বই পড়েন। আমাকে সেজন্য বেশি দেখেন শুনেননি, আমি নিজে নিজেই বড় হয়েছি। নিজে নিজে বড় হলে মনে হয়, মানুষের বেশি দুঃখকষ্ট হয় না। সে জন্যে আমার বেশি দুঃখকষ্ট নেই।

আরেকজন যে চাচা এই বাসায় থাকেন না, তিনি হচ্ছেন হীরা চাচা। হীরা চাচা আমেরিকা থাকেন। সেখানে নাকি লস এঞ্জেলস বলে একটা শহর আছে। সেই শহরে নাকি একটা পাহাড় আছে। তার কাছে নাকি একটা সমুদ্র আছে। সেই সমুদ্রের কাছে একটা ছবির মত বাসায় থাকেন হীরা চাচা।

হীরা চাচাকে আমি অনেকদিন দেখি না। শেষবার যখন দেখেছি তখন আমি অনেক ছোট, পরিষ্কার করে মনে নেই। শুধু মনে আছে, তাঁর ঠিক আমার সমান একটা ছেলে, সে দিনরাত শুধু ট্যাট্যা করে চেঁচাচ্ছে, আর সবাই সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত

হয়ে ছোটাছুটি করছে ! হীরা চাচা মাঝে মাঝে আমেরিকা থেকে ছবি পাঠান, ছবিতে তাঁকে দেখায় খুব সুন্দর, ধৰ্মথবে সাদা গায়ের বঙ্গ। তার মাঝে গোলাপী গাল।

আমার তিন ফুফু, তাদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ফুফুর বিয়ে আবার ভেঙেও গেছে। ছোট ফুফা মানুষটাকে আমার ভালই লাগত, একেবারে সিনেমার নায়কদের মত চেহারা কিন্তু মানুষটা নাকি ভীৰুণ বদমাইস। কেন বদমাইস সেটা বাচ্চা বলে আমাদের শুনানো হয় না কিন্তু আমরা ঠিকই জানি, শুধু বড়দের সামনে ভান করি যে কিছুই জানি না। বিয়ে ভাঙার পর থেকে ছোট ফুফু এখানে থাকেন। আমার মায়ের মত ছোট ফুফু ‘অন্যরকম’ হয়ে যাননি ; কিন্তু দিনরাত চৰিশ ঘণ্টা সবার ওপর রেগেমেগে আগুন হয়ে থাকেন। কেউ তাঁর ধারেকাছে যাবার সাহস পায় না। ছোট ফুফুর ছেলে রাজু আমার সাথে এক স্কুলে পড়ে। আমার থেকে সে এক ক্লাস উপরে কিন্তু তবু সে আমার এক নম্বর বন্ধু। এ বানায় আমাদের বয়সী আর কোন বাচ্চা নেই। যারা আছে তারা হয় অনেক ছোট, দিনরাত আমাদের জুলাতন করে, না হয় অনেক বড়, যারা আমাদের মানুষ বলে বিবেচনা করে না।

যেমন ধৰা যাক, বড় চাচার কথা। তার ধারণা, ছোট বাচ্চারা হচ্ছে সাক্ষাৎ ইবলিশ। হয় তাদের ধৰে শক্ত পিটুনি দেয়া দরকার, না হয় ধসক দিরে ঠাণ্ডা করে রাখা দরকার। সেজন্যে আমি বড় চাচাকে দুই চোখে দেখতে পারি না। অ ছাড়া বড় চাচার মত কৃপণ মানুষ এই পৃথিবীতে মনে হয় আর একটাও নেই। যদি অলিম্পিকে কৃপণ মানুষদের প্রতিযোগিতা থাকত, তাহলে বড় চাচা বাংলাদেশের হয়ে একই সাথে স্বর্ণ পদক আর রৌপ্য পদক নিয়ে আসতে পারতেন। তাঁর হাত থেকে একবার একটা আধুলি গড়িয়ে নালায় পড়ে গিয়েছিল বলে তিনি আধ ঘণ্টা একটা কাঠি দিয়ে নালার মঘলা ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন। পেনসিল যখন লিখে লিখে ছোট হয়ে যায়, আর যখন সেটা হাত দিয়ে ধৰা যায় না, বড় চাচা তখন বাঁশের কঢ়িও বেঁপে সেটা লম্বা করে নেন। আমাদের স্কুলের লেখালেখি করতে হয় পেনসিল দিয়ে। একবার লেখার পর বড় চাচা রাবার দিয়ে ঘয়ে ঘয়ে লেখাগুলো তুলে সেখানে আবার লিখেন। চিনির দাষ বেশি বলে বড় চাচা লবণ দিয়ে চা খান। আমাদের বাসায় পয়সা দিয়ে কোন খবরের কাগজ কেনা হয় না, বড় চাচা রাস্তার মোড় থেকে পড়ে আসেন। সকালবেলা বড় চাচার মুখ দেখলে নাকি সমস্ত দিন বরবাদ হয়ে যায়। বড় চাচা রিটায়ার করে চৰিশ ঘণ্টা বাসায় থাকেন, সারা দিনে একটু পরে পরে তাঁর মুখ দেখতে হয় বলে মনে হয় আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

বড় চাচার পরের জন হচ্ছেন জয়নাল চাচা। জয়নাল চাচা হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে নীরস মানুষ। সব সময় জয়নাল চাচা ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে থাকেন। একটু পরে পরে কাঠিটা বের করে চোখ কুঁচকে দেখেন কান থেকে কিছু বের হল কি না। যদি কিছু বের হয়, তাহলে খুব যত্ন করে সেটা টেবিলের কোণায় মুছে ফেলেন। যখন তিনি ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছেন না, তখন তিনি ঘাঁটার কাঠি

দিয়ে দাঁত খোঁচতে থাকেন। খানিকক্ষণ দাঁত খুঁচিয়ে তিনি কাঠিটা নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখে মুখ বিকৃত করে ফেলেন। যদি নিজের মুখের দুর্গন্ধি নিজের কাছে এত খারাপ লাগে, তাহলে সেটা শুঁকতে যান কেন সেটা এক রহস্য। এই রকম নানা ধরনের নোংরা কাজ ছাড়া জয়নাল চাচার আর কোন কিছুতে উৎসাহ নেই। সেবার বখন সাহিত্যেনে দুই লাখ লোক মরে গেল আমি জয়নাল চাচাকে খবরটা দিয়েছিলাম। শুনেও তিনি কান চুলকানো বন্ধ করলেন না। মুখে বললেন, অ। যেদিন আমেরিকা ইরাকে গিয়ে বোমা ফেলল, তিনি শুনেটুনে একটা হাই তুলে বললেন, অ। নীরা হত্যা যামলায় সাইফুদ্দিনের ফাসির খবর শুনেও সেই একই ব্যাপার। বললেন, অ। আমাদের এই জয়নাল চাচা অফিসে কি করেন আর অন্যেরা তাঁকে কিভাবে সহ্য করে আমার জানার খুব ইচ্ছে।

আমাদের চাচাদের আরেক ভাই হচ্ছেন সুন্দর চাচা। সুন্দর চাচার আসল নাম চান্দু, কিন্তু তাকে সেই নামে ডাকলে তিনি খুব রেঁগে যান। তাই তাকে সুন্দর চাচা বলে ডাকতে হয়। কেন তাকে সুন্দর চাচা ডাকতে হয় সেটা একটা রহস্য। তার মাঝে সুন্দরের কিছু নেই। তার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। তিনি গানাভাবে চুলগুলোকে এদিক সেদিক পাঠিয়ে টাকটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন। তার সামনের দুটো দাঁত একটু উচু। বেশ কষ্ট করে সেটা ঠোঁট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। তবে তার গায়ের রঙ ফর্সা। মানুষের গায়ের রঙ ফর্সা হলেই কি তাকে সুন্দর বলা যায়? সুন্দর চাচার গোলমাল অবশ্যি অন্য জায়গায়, তার মত এতবড় গালগল্প আর কেউ করতে পারে না। কোন অফিসে কেরানীর চাকরি করেন, কিন্তু তার কথা শুনলে মনে হয় তিনি বুঝি পাটমন্ত্রী বা আর কিছু। তিনি এক লাখ দু'লাখ টাকা ছাড়া কথা বলেন না। জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং নিয়ে যেভাবে কথা বলেন, তাতে মনে হতে পারে সব তার নাকের ডাগায়। দেশের সব বড় বড় মানুষ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করেন যেন সবাইকে তিনি চেনেন। তার পরামর্শ ছাড়া কেউ কোন কাজকর্ম করে না। সুন্দর চাচার কথা শুনলেই বোঝা যায় যে তিনি গুলপট্টি মারছেন। কিন্তু তিনি নিজে সেটা বুঝতে পারেন না। একজন বয়স্ক মানুষ গুলপট্টি মারছে শুনতে কেমন লাগে?

এই বাসার সবচেয়ে আজব মানুষ হচ্ছেন ছেট চাচা। তবে ছেট চাচা আজব হলেও মানুষটি খুব ভাল। বাসার বড়দের সবার ধারণা ছেট চাচা নিষ্কর্মা এবং অপদার্থ। কিন্তু ছেট চাচা মোটেও অপদার্থ না। ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, অনার্স পরীক্ষার আগে ঘোষণা করলেন এ বছর পরীক্ষা দেবেন না। পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি আউট হয়ে গেছে। আউট হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা দেয়া আর গোবর খাওয়ার মাঝে নাকি কোন পার্থক্য নেই।

বাসার সবাই তখন খুব রাগ করল। সুন্দর চাচা বললেন, প্রশ্ন যদি আউট হয়ে থাকে, তাহলে এটাই তো সুযোগ, কিন্তু ছেট চাচা রাজি হলেন না। তার হাতখরচের টাকা আটকে দেয়া হবে বলে ভয় দেখানো হল কিন্তু ছেট চাচা গা করলেন না। প্রথম

ক'দিন ঘরে বসে যোগ ব্যায়াম প্র্যাকটিস করলেন (পদ্মাসনে ঠোখ বক করে বসে থাকতেন, তখন গোলমাল করা নিষেধ ছিল)। তারপর চুল দাঢ়ি কাটা বন্ধ করে দিয়ে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। শুধু আতপ চাউল ধোয়া পানি খেতেন। ক'দিনের মাঝেই না খেয়ে খেয়ে তার চেহারা খারাপ হয়ে গেল। তখন আবার হঠাতে করে খাওয়া শুরু করলেন, আর সে কী খাওয়া! চুল দাঢ়ি বড় হয়ে যখন তাকে চে গুয়েভারার মত দেখাতে লাগল, তখন তিনি হঠাতে করে দাঢ়ি গোফ কামিয়ে ঘোষণা করলেন, তিনি বাসায় সাপের চাষ করবেন। সাপের বিষ নাকি সোনার দরে বিক্রি হয়। অনেক হৈ চৈ করে কোথা থেকে একটা ডোরা সাপ ধরে আনা হল। একটা কাঁচের বয়ামে সেটা থাকত, খাবার দাবারে সেটার বেশি রুটি ছিল না। তাই অনেক খুঁজে একটা ইন্দুর ধরে আনা হল। সাপটা সত্যি যখন সেই ইন্দুরটাকে গিলে ফেলল, তখন বাসার সব বড়ো 'হ্যাক খুঁ' 'হ্যাক খুঁ' বলে ছেট চাচাকে প্রায় বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিল। সাপের চাষ করত্ব এগুতো বলা যায় না কিন্তু তার মাঝে একদিন সাপটা বয়াম থেকে পালিয়ে গেল। এতদিন মানুষ দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে মানুষকে ভুল পায় না। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে বড় চাটীর পা পেঁচিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। সেটা দেখে বড় চাটী ভয়ঙ্কর একটা চিংকার করে ফিট! বাসার কাজের শেরেটি কাছে বসে রুটি বেলচিল। বেলুন দিয়ে এক ঘা বসিয়ে সাপের বারোটা বাজিয়ে দিল। সেই ঘটনার পর এই বাসায় সাপের চাষ এবং ছেট চাচার ভবিষ্যৎ দুটোই একেবারে শোষ হয়ে গিয়েছে।

তবু এই বাসায় ছেট চাচা আছেন বলে আমরা কেনমতে টিকে আছি: তা না হলে সারা পৃথিবীতে এই বাসার মত নীরস আর আনন্দহীন বাসা মনে হয় একটিও নেই। গালিগালাজ ধমক খেয়ে আমরা বড় হই। বাসায় খেলার জায়গা নেই। ছাদে কিংবা বাসার সামনে এক চিলতে জায়গায় কিছু খেলার চেষ্টা করলেই সবুজ চিংকার হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ছেট ফুফুর বিয়ে ভেঙে এ বাসায় যখন এসে উঠেছিলন, তখন বাসায় একটু উত্তেজনা হয়েছিল, রাজু আসার পর আমার একটা বন্ধু হয়েছে: কিন্তু তারপর আর কিছু ঘটে নি। মনে হয় না কিছু ঘটবে। এই রকম করে বড় হয়ে হয়ে মনে হয় এক সময় আমরা কেউ বড় চাচা, কেউ জয়নাল চাচা আর কেউ সুন্দর চাচা হয়ে যাব। খুব কপাল ভাল থাকলে হয়ত ছেট চাচা হব। কিন্তু সে রকম কপাল আর ক'জনের হয়?

এরকম সময় আমাদের বাসায় হীরা চাচার একটা চিঠি এল আয়েরিকা থেকে। সুন্দীর্ঘ চিঠি, বড় চাচার নামে এসেছে কিন্তু সবাইকে উদ্দেশ্য করে লেখা। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে এরকম :

তাঁর বড় ছেলে খালেদের বয়স প্রায় তেরো হতে চলল : কিন্তু সে এখনো তার পূর্বপূরুষের দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার জন্যে খালেদকে তিন মাসের জন্যে দেশে পাঠানো হবে, যেন সে দেশের পরিবেশে তিন মাস থেকে নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে

একটা ধারণা করতে পারে।

চিঠিটা পড়ে আমাদের মাঝে উজ্জেব্বলার একটা টেউ বয়ে গেল। খালেদের বয়স তেরো অর্থাৎ একেবারে আমার আর রাজুর বয়স। আমেরিকা থেকে আসছে, মনে হয় একটা বাংলা শব্দও জানে না। কী সাজ্জাতিক ব্যাপার!

বাসার সব বড় মানুষেরা বসে খুব গন্তব্যির গলায় আলোচনা শুরু করে দিল। বড় চাচা বললেন, খালেদ হীরার ছেলে মানলাম, কিন্তু একেবারে আমেরিকান বাচ্চা। এই বাচ্চাকে দেশে রাখার একটা খরচপাতি আছে না?

সুন্দর চাচা বললেন, হীরার মাথায় তো বুদ্ধিমুদ্রা নিশ্চয়ই আছে। টাকাপয়সা নিশ্চয় দিয়েই পাঠাবে।

বড় চাচার চোখ সাথে সাথে লোভে চকচক করে ওঠে। মাথা নেড়ে বললেন, নিশ্চয়ই পাঠাবে। নিশ্চয়ই পাঠাবে।

ছোট ফুফু বললেন, কি খাবে এখানে?

বড় চাচী বললেন, ভাত মাছ কি খায়? পাওয়া যায় এই দেশে?

কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না। আমাদের বাসায় মেয়েদের কোন রকম ঘানসম্মান নেই। সময় সময় মনে হয় তাদের অবস্থা বাচ্চাদের থেকেও খারাপ। একটু পরে বড় চাচা বললেন, আজকাল খাবার দাবারের যা দাম!

সুন্দর চাচা বললেন, সোনার গাঁ হোটেলের ম্যানেজারের সাথে আমার জনাশোনা আছে। আমি বলে দেব, হামবার্গার আর হট ডগ পাঠিয়ে দেবে বাসায়।

ছোট চাচা বললেন, বিদেশ থেকে একটা ছেলে দেশে এসেছে কি শুধু হামবার্গার আর হট ডগ খাওয়ার জন্যে?

জয়নাল চাচা কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন, আ।

আমার মা টেবিলের এক মাথায় মাথা ঞেজে কি একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। হঠাৎ একটু হেসে ফেললেন। ছোট চাচা বললেন, ভাবী, আপনার কি মনে হয়?

মা মাথা তুলে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ভেরি ইটারেশ্টিং।  
কি?

সাইক্লপ নামে এক চোখের দৈত্যের কথা লিখেছে। নাবিকেরা নাকি এক দীপে কঙ্কাল দেখেছে সাইক্লপের। বিরাট মাথা।

মা কথা বন্ধ করে আবার বহিয়ের মাঝে ডুবে গেলেন। এখানকার একটা কথাও শনেছেন বলে মনে হল না। কেউ আর তাকে বিরক্ত করল না। কখনো করে না।

রাজু ভয়ে ভয়ে বলল, কোথায় ঘুমাবে খালেদ?

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। এই বাসায় ছোটদের প্রশ্নেও কোন উত্তর দেয়া হয় না। খানিকক্ষণ পরে সুন্দর চাচা বললেন, উপরে একটা ঘর খালি করতে হবে।  
বিছানা বালিশ মশারি —

বড় চাচা মাথা চুলকে বললেন, যা দাম লেপ তোষকের।

জয়নাল চাচা নাক দিয়ে ঘোৎ করে একটা শব্দ করে লুঙ্গি চেপে শব্দ করে নাক  
ঝাড়লেন।

সুন্দর চাচা বললেন, আমার বোজু ফ্রেন্ডের এয়ার কন্ডিশনারের বিজনেস।  
সিঙ্গাপুর থেকে একটা চালান এসেছে। বললেই বাসায় লাগিয়ে দেবে।

রাজু আবার ভয়ে ভয়ে বলল, আমার ঘরে ঘুমাতে পারে। টেবিলটা সরালে  
আরেকটা বিছানার জারগা হয়ে যাবে।

ছোট চাচা মাথা নাড়লেন। অন্য সবাই রাজুর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। এই  
বাসায় ছোটদের সব কথা হয় বোকায়ি না হয় বেয়াদপি হিসেবে ধরা হয়।  
ভেবেছিলাম, রাজু একটা রাম ধরক খাবে, কিন্তু তার কপাল ভাল, খেল না। জয়নাল  
চাচা শুধু ঘোৎ করে একটা শব্দ করলেন।

রাতে ঘুমানোর সময় আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি জান ইরা চাচার  
ছেলে আসছে আমেরিকা থেকে?

মা অন্যমনস্কের মত বললেন, তাই নাকি! আসছে নাকি?

হ্যাঁ, মা।

মা চূপ করে আবার কি একটা ভাবতে লাগলেন। আমার কথা শুনেছেন বলে মনে  
হল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এক চোখের দৈত্যের কথা বলেছিলে মা?

হ্যাঁ। সাইক্লপ নাম।

কোথায় ছিল?

একটা দ্বীপে। মানুষ তার কঙ্কাল পেয়েছিল। সিন্দাবাদের গল্প পড়িস নি?

সত্যি পেয়েছিল মা?

মা হেসে ফেললেন। আজকাল আর বেশি হাসেন না, কিন্তু হাসলে মাকে এখনো  
কী সুন্দর দেখায়! মায়ের মাথার সব চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখটা কী সুন্দর,  
বাচ্চা মেয়েদের মত!

কি হল মা? হাস কেন?

দৈত্য কি কখনো থাকে নাকি!

তাহলে কঙ্কাল পেল কেমন করে?

হাতির কঙ্কাল। যেখান থেকে শুঁড় বের হয় সেখানে গর্ত, মনে হয় বুঝি চোখ।  
তাই মানুষ ভেবেছিল, এক চোখের দৈত্য। দৈত্য কি আর আলাদা করে হয়? মানুষই  
দৈত্য হতে পারে। পারে না? একান্তরে হয়েছিল না?

আমি কিছু না বুঝে মাথা নাড়লাম। মা অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে  
থেকে বললেন, ছেলেটা কষ্ট পাবে।

কোন্ ছেলেটা?

ইরার ছেলে। খালেদ। এই বাসায় কি মানুষ থাকতে পারে? পারে না। এই বাসায়

কোন আনন্দ নেই, কোন সুন্দর জিনিস নেই, কোন ভাল জিনিস নেই। এই বাসায় শুধু কৃৎসিত জিনিস। তুই কেমন করে থাকিস টোপন? আমি হলে তো যরেই যেতাম।

আমি একটু অবাক হয়ে আমার মাঝে দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মাথা খারাপ মা! আমার মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে যে, মা আমাকে একবার একটু বুকে চেপে আদর করবেন, কিন্তু মা আমাকে কখনো হাত দিয়ে ছুয়েও দেখেন না। এই ঘরে আমাদের আলাদা আলাদা বিছানা। আমি যখন শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি আমার মা তখন মশারিয়ে ভিতরে বসে বসে বই পড়েন।

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর আমার চোখে পানি এসে যেতে লাগল।

## ২. খালেদ

খালেদকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্যে বাসার সবাই এয়ারপোর্টে হাজির হল। একটা গাড়ি অনেক কষ্ট করে যোগাড় হয়েছে। সেটাতে ঠেলাঠেলি করে প্রায় সবাই এসে গেছে। সুন্দর চাচা বলেছিলেন, তাঁর এক বন্ধুর অনেকগুলো গাড়ি, তাকে সবসময় ব্যবহার করার জন্যে সাধাসাধি করেন। তাকে বলে একটা মাইক্রোবাস যোগাড় করে আনবেন। শেষ মুহূর্তে তিনি খবর আনলেন, গাড়ি নিয়ে সমস্যা হয়েছে। ইঞ্জিনের গোলমাল, কারবুরেটর না কি যেন পুড়ে গিয়েছে। তখন ছোট চাচা অনেক ছোটাছুটি করে এই গাড়িটা যোগাড় করেছেন। সেই গাড়িতে করে আমরা সবাই এয়ারপোর্টে এসেছি।

প্লেন সময়মত এসে নেমেছে, আমরা কাঁচের জানালা দিয়ে উকিবুকি মারছি, তখন শেষ পর্যন্ত খালেদকে দেখা গেল। এতটুকু ছেলে একা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে চলে এসেছে— আমাদের বিশ্বাস হয় না! তাকে দেখে অবশ্য আমাদের একটু আশাভঙ্গ হল। আমাদের সবার ধারণা ছিল, তার গায়ের রঙ হবে ফর্সা, গাল হবে গোলাপী। তার পরনে থাকবে কোট এবং টাই, হাতে থাকবে চামড়ার এ্যাটাচি কেস। কিন্তু দেখা গেল তার গায়ের রং আমাদের মত শ্যামলা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা অত্যন্ত টিলা একটা রং ওঠা টি-শার্ট। দেখে মনে হয়, ভুল করে অন্য কারোটা পরে চলে এসেছে। টি-শার্টের বুকে লেখা ‘ইকো ফাস্ট’। তার মানে কি খোদায় জানেন। তার প্যান্টটা ভূসভূসে নীল রঙের। শুধু তাই নয়, মনে হল হাঁটুর কাছে একটু ছেঁড়া। পিঠে ক্যাটকেটে সবুজ রঙের একটা ব্যাগ। মাথায় বাবান্দাওয়ালা একটা টুপি, সেটা আবার পরেছে উল্লেটা করে!

বড় চাচা বললেন, কাস্টমনে অনেক দেরি হবে। আমেরিকা থেকে আসছে। সুটকেস ভর্তি জিনিসপত্র। ছোট ছেলে পেয়ে অনেক হয়রানি করবে।

কিন্তু কাস্টমসে কোনই হয়রানি হল না। কারণ খালেদের কোন সুটকেসই নেই।

ঘাড়ের ক্যাটকেটে সবুজ ব্যাগটাই তার সব মালপত্র। আমেরিকা থেকে এই ছেলে একটা ছোট ঝোলা নিয়ে চলে এসেছে!

বড় চাচা ব্যাপারটা টের পেয়ে খুব ঘাবড়ে গেলেন। বারবার বলতে লাগলেন, কোন জিনিসপত্র আনে নাই? কী সর্বনাশ! ইরাটা এরকম গাধা হল কেমন করে? একটা ভি. সি. পি., কয়টা বিছানার চাদর আর টাওয়েল দিতে পারত না? হ্যাঁ, এই দেশে একটা খরচাপাতি আছে না?

জয়নাল চাচা কোন কথা না বলে খুব যত্ন করে তার নাকের একটা লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারটা তিনি নতুন আবিষ্কার করেছেন।

খালেদ গেট থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। আমরা জোরে জোরে হাত নাড়লাম, আমাদের দেখে সে তখন লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। বড় চাচা এগিয়ে এসে তার পা বাড়িয়ে দিলেন পা ছুঁয়ে সলাম করবে আশায়, খালেদ তার ধারেকাছে গেল না। বড় চাচাকে পাশ কাটিয়ে আমর আর রাজুর কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হায়।

মানুষজনের সর্বনাশ হয়ে গেলে মানুষ ‘হায় হায়’ করে, মহররমের মাসে শিয়াদের বুক চাপড়ে ‘হায় হাসান’ ‘হায় হোসেন’ বলে মাত্ম করতে দেখেছি, কিন্তু এখানে ‘হায়’ মানে নিশ্চয়ই ‘কি খবর’? আমরা কোন কথা না বলে দাঁত বের করে হেসে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলাম। সে এক সাথে আমার আর রাজুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ঠোপন?

আমি শুন্দ করে দিলাম, বললাম, টোপন।

সে আবার বলল, ঠোপন? তখন বুঝতে পারলাম যে, সে ‘ট’ বলতে পারে না। টিপু সুলতান নাটকে দেখেছিলাম ইংরেজ সাহেবরা এরকম করে কথা বলে। খালেদ তখন রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, ডাজু?

আমি আর রাজু আনন্দে হেসে ফেললাম, কি সুন্দর রাজুকে ডাকল ‘ডাজু’। ঠিক যেরকম আমরা ভেবেছিলাম। খালেদ নিজেকে দেখিয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, আমি ক্যালেদ।

আমরা হেসে গড়িয়ে পড়লাম। রাজু খালেদের পেটে গুঁতো দিয়ে বলল, দূর ছাই! তুমি ক্যালেদ হবে কোন দুঃখে? তুমি খালেদ।

খালেদ লাজুক মুখে আবার চেষ্টা করল, কাহলেদ?

শুনে আমরা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আর আমাদের দেখে খালেদও হাসতে শুরু করল। তখন আমি, রাজু আর খালেদ একজন আরেকজনকে ধরে হাসতে লাগলাম। আর হাসতে হাসতে বুঝতে পারলাম, এই ছেলেটা যদিও আমেরিকা থেকে বড় হয়েছে কিন্তু সে একেবারে আমাদের মত একজন।

আমাদের তিনজনকে এভাবে হাসাহাসি করতে দেখে বড়রা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা খুব বিরক্ত হল। বড় চাচা নিচু গলায় বললেন, আদব কায়দা কিছু শিখে নি মনে

হচ্ছে।

তিনি আবার এগিয়ে এসে কেশে গলা পরিষ্কার করে বইয়ের ভাষায় ইংরেজিতে বললেন, গুড ইভিনিং খালেদ।

খালেদ তার দিকে তাকাতেই তিনি তাঁর পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, আমি তোমার বড় চাচা। গ্রেট আক্সেল।

খালেদ হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বলল, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

বড় চাচাকে খুব সুখী দেখা গেল না। মুখ কালো করে হাত মিলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নিচু গলায় বললেন, আদব লেহাজ কিছু শেখায় নি। বেজন্ধা ছেলে।

খালেদ আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ফিসফিস করে ইংরেজিতে বলল, এই বুড়ো মনে হচ্ছে মহা বদ্যেজার্জি!

এয়ারপোর্টে খালেদকে যেমন হাসিখুশি এবং সবকিছুতে তার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, বাসায় এসে সেটা উবে গেল। তাকে দোষ দেয়া যায় না। আমাদের বাসায় এলে যে কোন মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। অঙ্ককার বাসা, ছোট ছোট ঝুম, ময়লা আসবাবপত্র, তেলতেলে রং ওঠা দেয়াল, মন ভাল হওয়ার কিছু নেই এই বাসায়। খালেদ খানিকক্ষণ বাইরের ঘরে বসে থেকে একবার বাথরুমে তুকে ফ্যাকাসে মুখে প্রায় ছিটকে বের হয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

খালেদ কোন উত্তর দিল না। কেমন জানি তায় পাওয়া চোখে মাথা নাড়ল। আমারও সেরকম সন্দেহ ছিল, আমাদের স্বীকৃতিস্থিতে অঙ্ককার ময়লা বাথরুমে গিয়ে সে একটা বড় ধাক্কা খাবে। বাথরুমে একটা বিশাল মাদী মাকড়সা মাঝে মাঝে পেটে ডিম নিয়ে বসে থাকে। কে জানে আজকেও বসে ছিল কি না!

বাতে খালেদের আসা উপলক্ষে ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পোলাও, মুরগির কোরমা, কাবাব, ইলিশ মাছের ভাজা, মালাদ আর বোরহানি। আমরা খুব শখ করে খেলাম। খালেদ অবশ্য কিছুই খেতে পারল না। প্লেটে খানিকটা পোলাও আর একটা মুরগির রান নিয়ে বসে রইল। আমেরিকায় নিশ্চয়ই কেউ কাউকে খাবার তুলে দেয় না। কারণ খালেদ খাচ্ছে না দেখে বড় চাচী এক সময় তার প্লেটে এক গাদা খাবার তুলে দিলেন। খালেদ তাই দেখে মনে হল আকাশ থেকে পড়ল। হাত উপরে তুলে অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো চাই নি! কেন আমাকে দিচ্ছ? কেন?

খালেদ কথাটা বলল ইংরেজিতে, সেটা বড় চাচীকে অনুবাদ করে শোনাতে হল। আর সেটা শুনে বড় চাচী হঠাৎ কেমন জানি খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন।

খালেদ বলতে গেলে কিছুই খেল না। যেটাই মুখে দেয়, সেটাই তার খাল লাগে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে খেল একটু পোলাও, অল্প একটু মুরগির গোশত আর বেশ অনেকখানি আলু। পানি খাবার আগে সে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল তার পানিটা ফেটালো কি না ওর ‘পিডিয়াট্রিশান’ নাকি বলে দিয়েছে পানিটা ফুটিয়ে থেতে। কঠিন

শব্দটার মানেটা কি কে জানে। মনে হয় ডাঙুরই হবে।

রাত্রি বেলা ঘূমানোর আগে খালেদ আমাদের ঘরে এসে যাকে বলল, চাচী, আমার বাবা আমাকে কয়েকটা ব্যাক্স ড্রাফট আর ট্রাভেলার্স চেক দিয়েছে, সেগুলো আপনাকে দিই ?

আমাকে ?

হ্যাঁ।

আমার মা খুব ভালো ইংরেজি জানেন। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, কেন বাবা ?

ওগুলো মনে হয় ব্যাক্সে জমা দিয়ে ভাঙ্গাতে হবে।

আমি সেগুলো ভাঙ্গিয়ে দেব ?

হ্যাঁ।

খালেদ জানে না আমাদের বাসায় মেরেমানুষদের বলতে গেলে মানুষ বনেই বিবেচনা করা হয় না। টাকা পয়সার ব্যাপারে, বিশেষ করে ব্যাক্স ড্রাফট কিংবা ট্র্যাভেলার্স চেক তো কখনোই কোন মেয়ের হাতে দেয়া হবে না ; তার ওপর আমার মা, যিনি গত দশ বছরে কোনদিন বাসা থেকে বের হননি, সবাই মনে করে যার একটু মাথা খারাপের লক্ষণ আছে— তাকে দেয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না ; আমি খালেদকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মা বেশ শাস্ত গলায় বললেন, ঠিক আছে বাবা, রেখে যাও। কাল ভোরে তোমাকে নিয়ে যাব।

দরজার বাহিরে কয়েকজন উকিবুকি দিচ্ছিল। মুহূর্তে সারা বাসায় খবর ছড়িয়ে গেল যে, খালেদ তার সমস্ত টাকাপয়সা আমার মা'র হাতে দিয়েছে, আর মা সেগুলো নিয়ে কাল ব্যাক্সে ভাঙ্গাতে যাবেন। শুনে উকেজনায় জয়নাল চাচা দু' দু'বার ঘোৰ ঘোৰ শব্দ করে এক টান দিয়ে নাকের কয়েকটা লোম ছিঁড়ে ফেললেন। বড় চাচা'র প্রায় হার্টফেল করার মত অবস্থা হল, নিজের বুক চেপে ধরে একটা কেঁজারে বসে পড়ে বললেন, শাহানা ব্যাক্সে যাবে? টাকা ভাঙ্গাতে? ডাক শাহানাকে !

শাহানা আমার মায়ের নাম। কেউ আমার মাকে ডাকার সাহস পেল না। মা কখনো রাগারাগি করেন না, তবু সবাই মাকে খুব পায়, ছোট ফুফু দিন বাত রেগেমেগে চিৎকার করেন তবু মনে হয় মাকে তার থেকে অনেক বেশি ভয় পায়।

বড় চাচী মিনমিন করে কি একটা বলার চেষ্টা করছিলেনবড় চাচা তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বললেন, সাংসারিক কোন জ্ঞান নেই, কিছু জানে না, কাউকে চেনে না, কোথায় গিয়ে কি করবে শাহানা ? গুণ্ডা বদমাইস গিজগিজ করছে চারদিক !

সুন্দর চাচা বললেন, আমাকে বললেই হত, গ্রিন্ডলেজ ব্যাক্সের ম্যানেজার আমার বোজন ফ্রেণ্ড। একটা ফোন করে দিলেই—

ছোট চাচাও বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন তবু নিজেকে শাস্ত রেখে বললেন, এই বাসায় সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ ভাবী। চিন্তার কোন ব্যাপার নেই, ভাবী ঠিক সবকিছু সামলে

নেবেন।

খালেদ সব কথাবার্তা বুঝতে পারছিল বলে মনে হয় না তবু আন্দাজে ধরে নিল, মাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। হাতে একটা কিল দিয়ে বলল, সুপার লেডি ! দিনরাত বই পড়েন। কী সাংঘাতিক !

সবাই অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকাল। বই পড়া জিনিসটাকে এই বাসায় সময় নষ্ট বলে ধরা হয়। পাঠ্যবই না হলে সেটাকে ‘আউট বই’ বলা হয়। কম বয়সীরা ‘আউট বই’ পড়লে নষ্ট হয়ে যায় বলে এই বাসায় ‘আউট বই’ পড়া নিষেধ। আমরা যদি পড়তে চাই লুকিয়ে পড়ি। ধরা পড়লে শক্ত মার খেতে হয়।

রাতে ঘুমানোর সময় আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি ব্যাকে গিয়ে টাকা ভাঙ্গতে পারবে ?

মা বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, কি টাকা ?

খালেদ যে টাকা দিয়েছে।

মা অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কোন খালেদ ?

আমি বুঝতে পারলাম মা আমার কথা ঠিক শুনছেন না, তাঁর বইয়ে ডুবে আছেন। আমি তাকে আর ঘাটালাম না।

পরদিন ভোরে সারা বাসায় একটা চাপা উত্তেজনা। আমার সন্দেহ ছিল যে, মা হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু দেখলাম মা ভোলেন নি। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে আলমারি খুলে একটা ভাল শাড়ি বের করে পরলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করলেন, তাঁর হাতঘড়িটা বের করে সেটা চাবি দিয়ে চালানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু যে ঘড়ি দশ বছর চালানো হয় নি, সেটা চলতে রাজি হল না। মা ছোট চাচাকে ডেকে বললেন, তোমার ঘড়িটা দাও দেখি।

ছোট চাচা তাড়াতাড়ি তাঁর ঘড়িটা খুলে দিলেন। মায়ের সুন্দর হাতে ছোট চাচার গোবদ্ধা ঘড়িটা খুব খারাপ দেখাতে লাগল কিন্তু মায়ের সেটা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা হল বলে মনে হল না।

ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু লাগবে ভবী ?

না।

খুচরা টাকা আছে ?

আছে। মা খালেদকে বললেন, চল বাবা।

খালেদ আজকে কমলা রঙের একটা টি শাট পরেছে। বুকে লেখা ‘সেভ দা ট্রীজ’ — গাছকে বাঁচাও। গাছকে কেমন করে বাঁচায় কে জানে। তার ক্যাটক্যাটে সবুজ রঙের ব্যাগটা ঘাড়ে নিয়ে সে মায়ের সাথে রওনা দিল।

মা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন তখন পিছু পিছু বাসার সবাই হেঁটে হেঁটে নামতে

লাগল। গেটের কাছে এসে বড় চাচা শেষবার মাকে থাগানোর চেষ্টা করলেন। বললেন,  
শাহনা—

মা চোখ তুলে তাকালেন আর সাথে সাথে বড় চাচা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ইয়ে  
মানে যা রোদ একটা ছাতা দেব? আমব্রেলা?

মা কিছু বলার আগেই খালেদ বলল, মাথা খারাপ হয়েছে? ছাতা? এই সুন্দর  
রোদে?

রোদ আবার সুন্দর হয় কেমন করে কে জানে।

মা খালেদকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা দেখলাম মোড়ে একটা রিকশা  
থামিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে স্টোতে উঠে বসলেন, তারপর দুঃজন রিকশা করে  
চলে গেলেন।

বাসায় একটা থমথমে আবহাওয়া নেমে এল। বড় চাচা বাজারে যেতে দেরি করছে  
অজুহাতে খামোখা কাজের ছেলেটার গালে একটা চড় কসিয়ে দিলেন। জয়নাল চাচা  
আর সুন্দর চাচা খুব গভীর মুখে অফিসে গেলেন, যাবার সময় এমনভাবে আমার দিকে  
তাকাতে লাগলেন যেন সব দোষ আমার। আঘি চুপচাপ ছাদে গিয়ে বসে রইলাম।  
শুনতে পেলাম নিচে থেকে ছোট ফুফু বলছেন আমার মাকে অনেক আগেই পাগলা  
গারদে আটকে রাখা উচিত ছিল তাহলে এখন আর এরকম ঝামেলা হত না।

মা খালেদকে নিয়ে-সকালে বের হয়েছেন, ঘণ্টা দু'তিনের মাঝে ফিরে আসার কথা  
ছিল কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেল তবু তাদের দেখা নেই। আস্তে আস্তে সবাই মায়ের ওপর  
ক্ষেপে উঠতে লাগল। বড় চাচা বললেন, মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কত হবে? খামোখা  
কোরআন শরিফে লিখেছে যে, মেয়েদের ধরে মারপিট করা দুরস্ত আছে?

বড় চাচী আর মেজ চাচী মুখ ঢেকে কি একটা বললেন ঠিক বোঝা গেল না। শুধু  
ছোট চাচা বললেন, ব্যাক ড্রাফট ভাঙানো কি পানিভাত নাকি? সময় লাগবে না  
একটু? কেউ ভাঙিয়েছে কখনো?

আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে গেল তবু মায়ের কোন দেখা নেই। অফিস থেকে সুন্দর  
চাচা আর জয়নাল চাচা ফিরে এসে খুব গভীর হয়ে বসে রইলেন। রাগের বদলে তখন  
আস্তে আস্তে সবাই ভয় পেতে শুরু করল। সুন্দর চাচা বললেন, মোড়ের দোকান  
থেকে সিটি এস. পি.কে একটা ফোন করে আসব?

কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না। ছোট চাচা বাহিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, একবার  
রাস্তা ধরে এগিয়ে যান তারপর ফিরে আসেন। ভয়ে আমার কান্না পেতে লাগল, কি  
করব বুঝতে না পেরে ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

মা খালেদকে নিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন সঙ্গে পার হয়ে গেছে। রিকশাভর্তি  
বিচিত্র সব জিনিস, এক কাঁদি কলা, একটা মাটির কলসি, বেশ কিছু কবুতর আর এক

ঝাঁকা চিনেবাদাম। দেখে বোৰা যাচ্ছে কেন চিনেবাদামওয়ালার কাছ থেকে ঝাঁকাসহ কিনে নেৱা হয়েছে। রিকশাওয়ালা খুব উৎসাহ নিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে দিল, কথা শুনে বুঝতে পারলাম সকালে যে রিকশাওয়ালাকে নিয়ে বের হয়েছেন, সেই সারাদিন মা আৰ খালেদকে নিয়ে ঘুৰেছে।

বড় চাচা খুব রেগে আছেন, আমি জানি পারলে আমার মাকে একেবাবে চিবিয়ে থেয়ে ফেলতেন, কিন্তু মায়ের সাথে কারো রেগে কথা বলার সাহস নেই। শুধু ছেট চাচা বললেন, ভৱী, এতো দেরি হল, কোন অনুবিধে হয় নি তো?

না। আজকাল মানুষজন অনেক ভাল হয়ে গেছে। নিজে থেকে এসে সাহায্য করে। ব্যাকের ম্যানেজার অনেক সাহায্য করলেন।

মায়ের কথা শুনে বড় চাচা চোখ কপালে তুললেন, তাঁর ধারণা পৃথিবীতে সব মানুষ চোর আৰ বদমাইস, সবাই একে অন্যকে ঠকানোৰ চেষ্টা কৰে, তাৰ মাঝে খুব সাবধানে থাকতে হয়। শুকনো গলায় মাকে জিঞ্জেস কৰলেন, ডলারে কত রেট পেয়েছে?

তা তো জানি না। ম্যানেজার যা দিল।

বড় চাচাকে দেখে ঘনে হল তাঁৰ হাঁট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। খাবি থেয়ে বললেন, দে-দে-দেখি।

খালেদেৰ কাছে পাসবই আছে। বাচ্চা ছেলে তাই আমার সাথে জয়েন্ট একাউন্ট কৰতে হল।

তো-তো-তোমার সাথে? বড় চাচা ভাঙ্গা গলায় বললেন, আৰ কারো সাথে কৰলে ভাল ছিল না? কোন পুৰুষ মানুষ, দৰকাৰ পড়লে যেন যেতে পাৰে। দায়িত্বশীল কেউ—

দৰকাৰ হবে না। আমি পুৱো চেকবইয়ে সাহিন কৰে খালেদকে দিয়ে দিয়েছি। এখন তাৰ যখন দৰকাৰ, সাহিন কৰে তুলে নেবে—

চে-চে-চেক সাহিন কৰে দিয়েছে? স-স-সব চেক?

হ্যা, মা গলা নামিয়ে বললেন, ব্যাকে অবশ্য কোন টাকা আছে কিনা জানি না। টাকা তুলে যা একটা কাণ্ড কৰল!

বড় চাচা সাবধানে একটা চেয়াৰে বসে দুৰ্বল গলায় বললেন, কি কাণ্ড?

নিউমার্কেটে যে বাচ্চা ছেলেৱা মিস্তিৰ কাজ কৰে, সেৱকম একজন ছিল সাথে। দুপুৱে যখন খাওয়াৰ সময় হল খালেদ বলল, তাকে নিয়ে খাবে। সেই মিস্তিৰ আবাৰ অনেক সঙ্গী সাথী। সবাইকে নিয়ে এক চাইনিজ বেশ্টুৱেন্টে—

চা-চা-চাইনিজ বেশ্টুৱেন্টে?

হ্যা, প্ৰথমে তো আমাদেৱ ঢুকতেই দেবে না, গৱিব ছেলেপুলে, খালি পা, খালি গা, হাতে ঝাঁকা, কেন ঢুকতে দেবে? তখন কয়েকটা কলেজেৱ ছেলে ছিল তাৰা হৈ চৈ শুৰু কৰে দিল। বলল, ঢুকতে না দিলে ওৱা পুৱো বেশ্টুৱেন্ট জ্বালিয়ে দেবে!

বড় চাচা আর কোন কথা বলতে পারছিলেন না। অনেক কষ্ট করে চি চি করে বললেন, তুমি করতে দিলে?

মা সুন্দর করে হাসলেন। বললেন, কেন দেব না? তার টাকা সে বেভাবে খরচ করতে চায়। মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, দৃশ্যটা যদি দেখতেন! বিশাল একটা টেবিলে প্রায় কুড়িজন বাচ্চা ছেলেমেয়ে হৈচৈ করে চাইনিজ খাচ্ছে। কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে গিয়ে হেসে গড়াগড়ি। সে যা একটা দৃশ্য!

এ বরকম সময় বাজু ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এল। বলল, টোপন? কি?

ছাদে চল।

কেন?

আকাশে কবুতর ওড়ানো হবে। খালেদ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বড় চাচা হঞ্চার দিয়ে বললেন, পয়সা দিয়ে কবুতর কিনে আকাশে ওড়াবে মানে? পয়সা কি গাছে ধরে?

মা হেসে বললেন, কি আছে! ছেট বাচ্চারা যদি পাগলামি না করে তাহলে কি বুড়োরা করবে?

বড় চাচার চোখ দিয়ে আগুন বের হতে লাগল।

### ৩. পরিচয়

সপ্তাহখানেক পরের কথা। খালেদ আজকাল বাংলা বেশ ভালই বুঝতে পারে। বলতে এখনো অসুবিধা হয় কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের ইচ্ছে সে ইংরেজিতে কথা বলুক, তার ইংরেজি উচ্চারণ এত বিদেশী যে আমাদের তাক লেগে যায়। খালেদ কিন্তু চেষ্টা করে বাংলায় কথা বলতে। ভুল বাংলা, অশুন্দ বাংলা, হাস্যকর বাংলা, কিন্তু বাংলা তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাইকে চোখ বুঝে সে তুমি করে ডাকে, কেউ কিছু মনে করে না, শুধু বড় চাচা খুব রেগে যান। বড় চাচা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাকে আদব কায়দা এবং ধর্ম শেখাতে কিন্তু খুব ভাল এগুচ্ছে বলে মনে হয় না। যেমন ধরা যাক, বাথরুমের সেই মাদি মাকড়সাটার কথা। হাদিসে নাকি আছে মাকড়সা মারা নিষেধ, তাই বড় চাচার কড়া হৃকুম কেউ সেই মাকড়সা মারতে পারবে না। সেটা শুনেও খালেদ একদিন এক ঝাঁটার আঘাতে মাকড়সাটার বারটা বাজিয়ে দিল। বাথরুমে কেউ তার দিকে আট চোখে তাকিয়ে আছে সেটা নাকি সে সহজে করতে পারবে না। বড় চাচা তাকে একটা বড় লেকচার দিলেন, খালেদ গা করল না।

তারপর ধরা যাক জয়নাল চাচার ব্যাপারটা। একদিন ঝাঁটার কাঠি দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে যাচ্ছেন, খালেদ হঠাৎ বলে বসল যে, সবার মাঝখানে বসে

দাত খোচানো খুব বাজে অভ্যাস। খোচাতেই যদি হয় তাহলে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে খোচানো উচিত। শুনে জয়নল চাচার চোখ গোল আলুর মত বড় হয়ে গেল। নাক দিয়ে ফৌস করে একটা শব্দ করলেন কিন্তু কিছু বললেন না। বড় চাচা একদিন কাজের ছেলেটাকে একটা চড় দিলেন, দেখে খালেদ বলল, এটা আমেরিকা হলে সে পুলিশে ফোন করে দিত আর পুলিশ এসে বড় চাচাকে ধরে নিয়ে যেতো। বড় চাচা থমথমে মুখে জানতে চাইলেন কেন, খালেদ বলল, শিশু নির্যাতনের অপরাধে। শুনে বড় চাচা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। সুন্দর চাচার গুলপট্টি শারাও মনে হয় আগের থেকে একটু কমেছে, কারণ প্রত্যেকবার সুন্দর চাচা একটা গুলপট্টি যারতেই খালেদ হা হা করে হেসে উঠে বলে যে সুন্দর চাচা নাকি সত্য আর মিথ্যার মাঝামাঝি একটা ফ্যান্টাসির জগতে বাস করেন। এর নাকি চিকিৎসা দরকার। ভাল রকম চিকিৎসা না হলে শেষ বয়সে সুন্দর চাচাকে নাকি পাগলা গারদে থাকতে হবে।

বড়দের মাঝে শুধু ছোট চাচার সাথে তার খানিকটা ভাব হল কিন্তু সেটাও খুব বেশি নয়। ছোট চাচা সিগারেট খান আর খালেদ দুই চোখে সিগারেট দেখতে পারে না। ছোট চাচাকে সিগারেট খেতে দেখলেই সে এমন হৈ তৈ শুরু করে যেন সিগারেট নয়, বিষ খাচ্ছেন। খালেদের অভ্যাচারে বাসায় ছোট চাচার সিগারেট খাওয়া বলতে গেলে বন্ধ, সিগারেট খাওয়ার অপকারিতার উপরে লম্বা লম্বা লেকচার শুনে খালেদকে দেখলেই ছোট চাচার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়।

বাসার মহিলাদের সাথে অবশ্যি খালেদের কোন সমস্যা নেই, তারা মনে হয় খালেদকে পছন্দই করেন। বড় চাচী, মেজো চাচী সবসময়ই বলছেন, আহা, এইটুকু ছেলে কোথায় কোন দেশে বাবা যাকে ফেলে একা চলে এসেছে। তাকে ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্যে সবার খুব আগ্রহ। কিন্তু খালেদ খাওয়া নিয়ে বেশি ব্যস্ত নয়। তার প্রিয় খাবার আলু ভাজা, আলু ভর্তা এবং আলু সেদ্দ। ভাত খায় আলাদা। একই জিনিস বাবার খেতে দেখে সবাই মনে হয় একটু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

খালেদের সাথে আমাদের অবশ্যি খুব ভাব হয়ে গেল। মনেই হয় না তাকে আগে কখনো দেখি নি। যখন আশে পাশে কেউ থাকে না, তখন সে মাঝেমাঝে আমেরিকার গল্প করে, নানা রকম নিষিঙ্ক গল্প, বড়রা জানতে পারলে মনে হয় খুনোখুনি হয়ে যাবে। খালেদের সাথে ইংরেজি বলার চেষ্টা করতে করতে আমাদের সবারই একটু একটু ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেল, হাস্যকর ইংরেজি কিন্তু তবু তো ইংরেজি !

এভাবে আরো সপ্তাহ খালেক কেটেছে। একদিন খাবার টেবিলে সবাই বসে খাচ্ছ তখন বড় চাচী খালেদকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমেরিকার মেয়েরা নাকি খুব বেহায়ার মত কাপড় পরে ?

বেহায়া কথাটার মানে কি খালেদকে বোঝাতে বেশ একটু সময় লাগল, বোঝার

পৰ মে পুৱো কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, সেটা মতি নয়।

বড় চাচা গন্তীর হয়ে বললেন, কি বলছ তুমি, আমি নিজে দেখেছি !

খালেদ অবাক হয়ে বলল, আপনি কখন দেখেছেন ? তার মুখে ‘আপনি’ কথাটা আসতে চায় না কিন্তু বড় চাচার সাথে জ্বের করে চেষ্টা করে।

তোমার স্কুলের ছেলেমেয়েদের ছবি। মেয়েদের ছোট ছেট কাপড়। আন্তাগফেরল্লাহ্। পা দেখা যাচ্ছে ! ছিঃ !

খালেদ প্রথমে একটু অবাক হল তারপর কেমন জানি রেগে উঠল, বলল, যেখানকার মানুব সেরকম রীতিনীতি। যেরকম পোশাকে তারা অভ্যন্ত, সেটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক। বাইরের মানুবের কাছে সেটা অস্বাভাবিক লাগলে কিছু করার নেই।

বড় চাচা বললেন, কিন্তু পরকাল রয়েছে, খোদার কঠিন শাস্তি রয়েছে।

খালেদ বলল, খোদার আর খোয়ে দেয়ে কাজ নেই—

তখন বড় চাচা ভীষণ রেগে গেলেন, তিনি যত জোরে কথা বলেন খালেদ তার থেকে জোরে কথা বলে, যাকে বলে একটা ফাটাফাটি অবস্থা। তর্ক যখন খুব জমে উঠেছে, প্রায় হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় তখন মা হঠাৎ বহি থেকে মুখ তুলে বললেন, আমার মনে হয় খালেদ আর বাচ্চারা মিলে কোন এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসুক।

বড় চাচা থতমত থেঁয়ে বললেন, কেন ?

মা বললেন, ছোট বাচ্চাদের বেড়াতে ভাল লাগে। এই বাচ্চারা অনেকদিন কোথাও বেড়ায় নি। তা ছাড়া এই বাসার পরিবেশ বলতে গেলে দৃষ্টিত ! আনন্দের কিছু নেই।

বড় চাচা মুখ হা করে তাকিয়ে রহিলেন। মা আবার বললেন, এদেশে অনেক সুন্দর জায়গা আছে, ঘূরে আসুক।

খালেদ টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, ইয়েস !

খালেদের সাথে থেকে থেকে আমাদেরও একটু একটু সাহস বেড়ে যাচ্ছে। আমরাও টেবিলে থাবা দিয়ে বললাম, ইয়েস !

সবাই চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। ছোট চাচা বললেন, কঞ্চিবাজার থেকে ঘূরে আসতে পারে। পঁয়টনের চমৎকার হোটেল আছে। সুন্দর বীচ।

বড় চাচা কেশে বললেন, কত পয়সা লাগে হোটেলে জানিস ?

খালেদ আবার টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, পয়সার কোন চিন্তা নেই। আমার ব্যাকে এখনো কত টাকা। সবাইকে নিয়ে খরচ করার জন্যে বাবা দিয়েছেন।

বড় চাচা চুপ মেরে গেলেন, একটু পরে বিড়বিড় করে বললেন, খরচ করতে দিয়েছে, নষ্ট করতে দেয় নি।

ছোট চাচা বললেন, মনে হয় ভাবী ঠিকই বলেছেন। বাচ্চারা ঘূরে আসুক। কঞ্চিবাজার খুব সুন্দর জায়গা। এত সুন্দর সমুদ্র আর কোথায় পাবে ?

জয়নাল চাচা নাকের একটা লোম ছিড়তে গিয়ে থেমে গেলেন, সুন্দর চাচা

পয়টিনের বড় অফিসারকে চেনেন এই ধরনের একটা কথা বলতে গিয়ে মনে হয় খালেদের ভয়েই থেমে গেলেন।

বড় চাচী এমনিতে বেশি কথা বলেন না, আজ মৃদু স্বরে কিন্তু বেশ জোর দিয়েই বললেন, আমারও মনে হয় কোন সুন্দর জায়গা থেকে ঘুরে আসুক। এ বাসায় আর কি আছে আনন্দ করার যত ?

বড় চাচা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গভীর গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমরা আরেকটু হলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতাম কিন্তু তার শেষ কথাটা শুনে একেবারে চুপসে গেলাম। বললেন, সাথে বড় মানুষ কাউকে যেতে হবে, আমি নিয়ে যাব।

বড় চাচার সাথে আমি বেহেশতেও যেতে রাজি না। যদি সত্যি সত্যি বড় চাচা বেহেশতে যান (আমার খুব সন্দেহ আছে) তাহলে মনে হয় মানুষজন খুন করে আমি দোজখেই যাবো। বড় চাচার সাথে কল্পবাজার যাওয়া হবে একটা বড় বিভীষিকা। পয়সা বাঁচানোর জন্যে তিনি এমন সব কাজ করবেন যে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাব। তার ভিতরে ভাল কোন গুণ নেই, তার সাথে ভাল কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না। বাসায় থাকলে তবু তার সাথে থাকতে হয় না, আমরা নিজেরা নিজেরা থাকতে পারি। সপ্তাহ খানেকের জন্যে কল্পবাজার গেলে চকিষ ঘণ্টা তাঁর সাথে থাকতে হবে, চিন্তা করেই আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে।

খুব মন খারাপ করে আমরা উঠে এলাম, ব্যাপারটা কিভাবে অগ্রসর হয় দেখতে হবে। যদি দেখা যায় সত্যি বড় চাচা আমাদের সাথে রওনা দিচ্ছেন তাহলে বগালে রসূন নিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে দ্বুর বাঁধিয়ে ফেলতে হবে।

খোদা আছেন কি নেই সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই আমরা চিন্তাভাবনা করি। খালেদের ধারণা খোদা বলে কিছু নেই। আমার ধারণা খোদা আছেন কিন্তু আমাদের জন্যে নেই। রাজুর ধারণা আমরা ঠিকমত নামাজ রোজা করি না বলে খোদা আমাদের দিকে নেই, যদি নিয়মিত জুম্মার নামাজ পড়তে শুরু করি তাহলেই খোদা আমাদের কথা শোনা শুরু করবেন। আমার কখনই সেটা ঠিক বিশ্বাস হয় নাই।

কিন্তু সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আমরা আবিষ্কার করলাম খোদা আছেন। শুধু যে আছেন তাই নয়, আমাদের দিকেই আছেন। খালেদ সেই মাদী মাকড়সাকে বাঁটা পেটা করার পরও খোদা মনে হয় তাকে এবং আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

আমাদের রওনা দেবার কথা শুক্রবার রাতে। বৃহস্পতিবার সকালে বড় চাচা দেখলেন মেঝেতে একটা আধুলি পড়ে আছে। বড় চাচা নিচু হয়ে সেই আধুলিটা তুলতে গিয়ে আর সোজা হতে পারলেন না। বাঁকা হয়ে থেকে চিৎকার করতে থাকেন, তার পিঠে কোথায় নাকি টান পড়ে গেছে। তাকে সেই অবস্থায় চ্যাংদোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল। পয়সা খরচ হবে বলে ডাক্তার ডাকা হল না। বড় চাচী

সর্বের তেলে রসুন দিয়ে গরম করে পিঠে মালিশ করতে লাগলেন, আর বড় চাচা গরুর মত চিৎকার করতে থাকলেন। সেই চিৎকার আমাদের কানে যে কি ঘন্থুর লাগল সেটা আর বলার মত নয় !

ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, হোটেল রিজার্ভেশন হয়ে গেছে, এখন তো আর কিছু বাতিল করা যায় না। বড় চাচা যেতে পারছেন না তাই ঠিক হল ছোট চাচা আমাদের সাথে যাবেন। এতদিন আমরা কোন উৎসাহ পাছলাম না, হঠাতে করে আমাদের মাঝে উৎসাহের বান ডাকল। আমরা আমাদের ব্যাগ বেঝাই করতে শুরু করলাম। ট্রেনে পড়ার জন্যে সায়েন্স ফিকশন, সমুদ্র দেখে ভাব এসে গেলে কবিতা লেখার জন্যে নোটিবই এবং কলম, ভ্রমণে কাজে লাগতে পারে সেজন্যে পকেটে রাখার মত ছোট চাকু, টর্চ লাহুট, ফাস্ট এইডের জন্যে ব্যান্ডেজ, এ্যান্টিসেপ্টিক, মাথা ধরার জন্যে এসপিরিন, পেটের গোলমালের ঔষধ। খালেদের একটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার আছে সেটাতে শোনার জন্যে গানের ক্যাসেট। ছোট চাচা একটা ক্যামেরা যোগাড় করার চেষ্টা করছিলেন তখন দেখা গেল খালেদের নিজেরই একটা ক্যামেরা আছে, তবে ছবি তোলার তার কোন শখ নেই। আমি আর রাজু খোঁজাখুঁজি করে মাথায় পরার জন্যে বারান্দাওয়ালা টুপি বের করলাম, বাসায় পরলে সবাই হাসাহাসি করবে, একবার বের হলেই মাথায় দিয়ে দেব। উৎসাহে আমাদের শেষ কয়েকটি ঘন্টা আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

## ৪. টি-রেক্ত

আমরা চট্টগ্রাম পৌছালাম খুব ভোরে। ট্রেনে ঘুমলো খুব সোজা নয়। বড় চাচা যাবেন ঠিক ছিল বলে সম্ভা টিকিট কিনেছেন, না হয় একেবারে ফাস্ট ক্লাসের টিকেট কেনা যেত আর আমরা একেবারে মন্ত্রীদের মত আরামে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারতাম। আমি কখনো ট্রেনে ফাস্ট ক্লাসে উঠি নাই, না জানি কত মজা ফাস্ট ক্লাসে ! অবশ্য সেটা নিয়ে আমাদের মনে একেবারেই কোন দুঃখ নাই, যখনহই মনে পড়ছে যে বড় চাচা বিছানায় বাঁকা হয়ে শুয়ে আছেন, আনন্দে আমাদের মন ভরে যাচ্ছে। খোদা সত্ত্বাই আছেন এবং আমাদের ওপর তাঁর নেক নজর আছে সেটা নিয়ে এখন আর আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কে জানে এবারে ফিরে গিয়ে হয়তো নিয়মিত জুন্মার নামাজ শুরু করে দেব।

আমরা বেশ খানিকক্ষণ ট্রেনে বসে থাকলাম। অঙ্ককার কেটে যখন একটু আলো হল আমরা ট্রেন থেকে নেমে এলাম, সাথে বেশি মালপত্র নেই, যে যার নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমেছি। খালেদের দেখাদেখি আমরাও টুপিটা পরেছি উল্টো করে, দেখতে নিশ্চয় একেবারে অভিযান্ত্রীদের মত লাগছে আমাদের। রাতে ভাল ঘূম হয়নি, চোখে

এখনো ঘূম লেগে আছে। হাত মুখ ধূয়ে কিছু একটা খাওয়া দরকার। আমাদের জন্যে  
কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু খালেদের খাওয়া নিয়ে অনেক যত্নগা। ফোটানো পানি ছাড়া  
কিছু খাওয়া নিষেধ, ভাল করে রান্না না করে খাওয়া নিষেধ। খোঁজাখুঁজি করে  
স্টেশনের বাইরে একটা রেস্টুরেন্ট বের করা হল, বাইরে তাওয়ায় পরোটা ভাজা  
হচ্ছে, গনগনে আগুন, কোন জীবাণু থাকার কথা নয়। আমরা সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকে  
গেলাম।

কল্পবাজারের বাসে যখন উঠেছি তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। বাসটা ছাড়তে  
একটু দেরি হল। বাসের ছাদে বস্তায় করে নানা রকম জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, বড় বড়  
টায়ার, কার্ডবোর্ডের বাজ্জি বোঝাই রঙচঙ্গে জিনিস, তেলের চিন, কি নেই! বাস ছাড়ার  
কিছুক্ষণের মাঝেই শহর থেকে বের হয়ে এলাম, দু পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ, বেশ লাগে তখন  
দেখতে। আমি খালেদকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে খালেদ?

ভালই। তবে—

তবে কি?

মনে হচ্ছে শরীরের পার্টস সব খুলে আসবে।

কেন?

ঝাঁকুনি দেখছ না?

আমি বেশ অবাক হলাম। চমৎকার রাস্তা, ঝাঁকুনির এমন কিছু চিহ্ন নেই।  
আমেরিকার রাস্তা কি মাথন দিয়ে তৈরি?

ভেবেছিলাম অভ্যেস নেই বলে এই ঝাঁকুনিতেই খালেদের শরীর খারাপ হয়ে  
যাবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার, তার কিছু হল না, ঘণ্টা দুরোক পর কথা নেই বার্তা নেই  
রাজু হড় হড় করে তার সামনে বসে থাকা মানুষটার ঘাড়ে বমি করে দিল। বমিতে  
আধা হজম হওয়া পরোটা, সব্জি সব আলাদা আলাদা করে চেনা যায়। সামনের  
মানুষটি খুব বিরক্ত হল সত্ত্বে কিন্তু বাচ্চা একটা ছেলে যদি শরীর খারাপ করে বমি  
করে দেয় তাহলে তো তার ওপরে বাগ করা যায় না। বাসটা থামানো হল একটু  
পরেই। একটা ছোট বাজারের মতন জায়গা। কয়েকটা দোকান, কিছু ফেরিওয়ালা,  
মাইক লাগানো একটা মসজিদ। বাসের সব মানুষ নেমে গেল, হাত পা ছড়িয়ে একটু  
হাঁটাহাঁটি করবে। রাজু যার ঘাড়ে বমি করে দিয়েছে সেই মানুষটিকে দেখলাম তার শার্ট  
খুলে খুব ভালো করে টিউবওয়েলে ধোয়ার চেষ্টা করছে।

বমি করার পর বোধ হয় রাজুর শরীর একটু ভাল লাগতে থাকে। দেখলাম সে  
কথাবার্তা বলা শুরু করেছে, বাসে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বাসের ওপর থেকে  
কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে আবার অন্য জিনিসপত্র তোলা শুরু করেছে, মনে হয় বাস  
ছাড়তে একটু দেরি হবে। ছোট চাচা একটা সিগারেট ধরালেন এবং খালেদ সাথে সাথে  
তার লেকচার শুরু করল, বলল, সিগারেট খাওয়া আর নিজের মাথায় গুলি করার

মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

ছোট চাচা বললেন, আমি তো নিজের মাথায় করছি, তোমার মাথায় তো করছি না।

একটা সিগারেট খেলে দশ মিনিট আয়ু কমে যায়।

আয়ু যতো কমে তত ভাল। বুড়ো মানুষদের কত যন্ত্রণা দেখেছ?

সিগারেট খেলে লাংস ক্যান্সার হয়। লাংস ক্যান্সারের মৃত্যু ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মৃত্যু।

ছোট চাচা এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন, কোন মৃত্যু আবামের?

খালেদ তর্কে বেশি সুবিধে করতে না পেরে হঠাতে লাফিয়ে ছোট চাচার মুখ থেকে সিগারেটটা ছেঁ মেরে কেড়ে নিল। ছোট চাচা কিছু বোঝার আগেই সে সিগারেটটা ছুড়ে দিয়েছে রাস্তার ওপারে। অন্য কেউ হলে ছোট চাচা রেগে মেগে একটা কাণ করতেন, কিন্তু খালেদের ওপর বাগবনে কেমন করে? সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সিগারেট খাওয়া আর মানুষ খুন করার মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ছোট চাচা আরেকটা সিগারেট ধরাবেন কি না বুঝতে পারলেন না। খালেদের দিকে একবার বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেলেন। ঠিক তখন দেখতে পেলাম এক কোণায় বেশ কিছু মানুষের ঝটলা, সেখান থেকেই রাজু আমাদের হাত তুলে ডাকছে। রাস্তার পাশে আশ্চর্য মলম, দাঁতের মাজন, সাপ কিংবা বানরের খেলায় খালেদের খুব উৎসাহ, রাজুকে দেখে সে প্রায় সাথে সাথে ছুটে গেল।

ভিড় ঠেলে ঢুকে দেখি মাটিতে একটা চাদর বিছিয়ে সেখানে ছোট ছোট কোঁচায়, ছোট ছোট বাঞ্জে নানারকম গাছগাছড়া, ওষধপত্র সাজানো। পেছনে দড়ির মতো শুকনো একজন মানুষ চিৎকার করে হাত পা নেড়ে কথা বলছে। নানা রকম অসুবিধের বর্ণনা— বেশির ভাগই অসভ্য অসুখ এবং কিভাবে তার আশ্চর্য ওষুধ দিয়ে সেই সব অসুখ নিরাময় হয় তার উপরে বজ্রিতা। এক পাশে নানা রকম হাড়গোড়, একটা মানুষের মাথার খুলি আর একটা বিশাল হাড়। এতো বড় হাড় কোন প্রাণীর কে জানে।

খালেদ বড় হাড়টা দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কিসের হাড়?

আমি তো জানি না।

ছোট চাচা এই সময় বাস থেকে আমাদের নাম ধরে ডাকলেন। বাস নিশ্চয়ই ছেড়ে দিচ্ছে।

খালেদ তখনো অবাক হয়ে হাড়টার দিকে তাকিয়ে আছে, আমাকে আবার বলল, জিজ্ঞেস কর তো কিসের হাড়।

দড়ির মত শুকনো লোকটা তখন খুব উন্নেজিত হয়ে সপ্ত ধাতু দিয়ে তৈরি কি একটা মহৌষধের কথা বলছে, মাঝখানে তাকে বাধা দেয়া ঠিক না, কিন্তু আমাদের বাসও ছেড়ে দিচ্ছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না লোকটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেই হল, ওটা কিসের হাড়?

[www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)

---



লোকটা খতমত খেয়ে থেমে গেল। বেশ বিরক্ত হল, ভেবেছিলাম আমার কথার  
উত্তরই দেবে না, কিন্তু উত্তর দিল। গন্তীর হয়ে বলল, পাহাড়ি দানো।

পাহাড়ি দানো?

হ্যাঁ।

সেটা আবার কি?

পাহাড়ে থাকে। বটগাছের সমান উচু। একটা দাঁত হাত দুই লম্বা।

আমার মুখে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল, কারণ দেখলাম হঠাৎ  
লোকটা খুব গন্তীর হয়ে গেল। বলল, আমার কথা বিশ্বাস করলে না? মনে করছ দুই  
চার পাতা বই পড়েছ বলে আল্লাহর দুনিয়ায় যা যা আছে সব জান, হ্যাঁ?

আমি কিছু বললাম না। লোকটা এবার মাথা এগিয়ে বলল, এই হাঙ্গিটা এসে  
তুলো দেখি!

বাস একটা হর্ন দিল সাথে ছোট চাচার ক্রুক্ক গলার স্বর শুনতে পেলাম কিন্তু  
এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিই কেমন করে? এগিয়ে গিয়ে হাড়টা তোলার চেষ্টা  
করে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম, ভয়ংকর ভাবী— যেন হাড় নয়, পাথর। খালেদও  
এগিয়ে এসে তোলার চেষ্টা করল, পারল না। সে অবাক হয়ে একবার লোকটার দিকে  
তাকাল তারপর কেমন যেন অবিশ্বাসের দ্রষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ফসিল!

কি?

ফসিল।

ফসিল?

হ্যাঁ, ডাইনোসোরের ফসিল।

বাসটা খুব খারাপ ধরনের লম্বা একটা হর্ন দিয়ে নড়তে শুরু করল, খালেদ তখনো  
হাড়টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, চল খালেদ।

খালেদ ফিসফিস করে বলল, আমি যাব না।

কি বললে?

আমি যাব না।

আমি অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম, হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে সত্যিই  
যাবে না!

ছোট চাচা বেশি রাগেন না বলে রাগলে কি করতে হয় ঠিক জানেন না। বারবার  
শুধু ডান হাতটা ওপরে তুলে নাচার মত একটা ভঙ্গি করে একটু একটু তোতলাতে  
থাকেন। রাগলে ছোট চাচা ইংরেজিতে কথা বলতে থাকেন, বেশি রাগলে আবার  
ইংরেজিটাও ঠিক বের হয় না, ঢাকাহিয়া কথা বের হতে থাকে! রাগটা খালেদের উপরে,  
কিন্তু সে একেবারেই গা করল না, একটু পরে চোখ বড় বড় করে বলতে লাগল,  
ফসিল! সত্যিকারের ফসিল! ডাইনোসোরের ফসিল!

শেষ পর্যন্ত ছোট চাচার রাগ একটু কমল, বাস থেকে নামানো আমাদের মালপত্রের ওপর বসে পড়ে গজগজ করতে করতে একটা সিগারেট ধরালেন, খালেদ পর্যন্ত সেটা সহ্য করে গেল। বাসের টিকিটের ভাড়াটা এর মাঝে গেছে, সময় মত কম্বুবাজারে না পৌছালে হোটেলের রিজার্ভেশনের টাকাটাও গচ্ছা যাবে। বড় চাচা হলে এতক্ষণে খুনোখুনি হয়ে যেত, ছোট চাচা বলে রক্ষা।

ছোট চাচার মেজাজটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর খালেদ হাত পা নেড়ে বলল, এটা ডাইনোসোরের ফসিল।

তোমায় কে বলেছে এটা ডাইনোসোরের ফসিল?

পৃথিবীতে আর কোন জন্ম নাই যাব এতবড় হাড় আছে। আর এটা কতখানি ভারী দেখেছ? ঠিক ফসিল যে রকম হয়।

তুমি কেমন করে জান?

আমি জানি। গত বছর আমরা ডাইনোসোরের উপর একটা প্রজেক্ট করেছি। ডাইনোসোরের উপর পড়াশোনা করার জন্যে আমরা কয়েকজন পিটসবার্গ গিয়েছিলাম। আমি ফসিল চিনি।

হাঁম। ছোট চাচা গুম হয়ে বসে রইলেন।

একটা হাড় কত বড় সেটা দেখেই জন্মুর সাইজ বলা যায়। এটা বড় কোন ডাইনোসোর। ব্রাকিওসোরাস না হয় ডিপ্লোডোকাস। লোকটার কথা যদি সত্য হয় যে, এর দু'হাত লম্বা দাঁত তাহলে এটা নিশ্চয়ই টি-রেক্স।

টি-রেক্স?

হ্যাঁ। টাইরানোসোরাস রেক্স। সংক্ষেপে টি-রেক্স। ভয়ঙ্কর ডাইনোসোর!

ছোট চাচা কোন কথা বললেন না, খালেদ আবার চোখ বড় বড় করে বলল, বিশ্বাস করতে পারেন যে আশপাশে কোথাও ডাইনোসোরের ফসিল রয়েছে। সত্যিকারের ফসিল! বিশ্বাস করেন?

খালেদের এরকম উদ্দেশ্যনা দেখে আমি আর রাজুও মোটামুটি উদ্দেশ্যিত হয়ে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, ছোট চাচা ও মাথা নাড়লেন, বললেন, তা ঠিক, পৃথিবীতে ডাইনোসোরের ফসিল আর কত জায়গায় পাওয়া যায়?

আমাদের খুজে বের করতে হবে জায়গাটা।

ছোট চাচা একটু অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লেন।

রাজু জিঞ্জেস করল, কেমন করে বের করবে?

খালেদ বলল, ঐ লোকটাকে জিঞ্জেস করতে হবে কোথায় পেয়েছে।

আমি বললাম, আমরা জিঞ্জেস করলে আমাদের হয়তো পাতাই দেবে না, ছোট চাচা, আপনাকে জিঞ্জেস করতে হবে।

ছোট চাচা তার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, চল চাই।

ওযুধ বিক্রি করার শুকনো মানুষটার কাছে তখন ভিড় একটু কম। সে লম্বা বক্তৃতা

দিয়ে মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বসে বসে তাই বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের দেখে ভুক্ত কুচকে তাকাল। ছেট চাচা জিজ্ঞেস করলেন, কি চাচা যিয়া, ব্যবসাপাতি কেমন? নবযৌবন সালসা কেমন চলছে?

আর ব্যবসাপাতি! লোকজনের ভাত খাওয়ার পয়সা নেই, নবযৌবন সালসা কিনে কেমন করে?

লোক ঠকানোর বিজনেস, যত কম হয় ততই ভাল! কি বলেন?

ভাবলাম ছেট চাচার কথা শুনে লোকটা খুব রেগে যাবে, কিন্তু রাগল না। মুখ বাঁকা করে একটু হেসে বলল, কি চান বলেন?

ছেট চাচা ডাইনোসোরের ফসিলটা দেখিয়ে বললেন, এই হাড়টা কোথায় পেয়েছেন?

লোকটা ভুক্ত কুচকে বলল, কেন?

এমনি জানতে চাই।

এমনি?

হ্যাঁ, ছেট চাচা উদাস মুখে বললেন, এমনি। কোথায় পেয়েছেন?

লোকটা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছেট চাচার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, বলতে পারি কিন্তু পাঁচশ টাকা লাগবে।

ছেট চাচা হে হে করে খুব খারাপ ভঙ্গি করে হেসে উঠে বললেন, আপনার কি ধারণা গাছে টাকা ধরে? হ্যাঁ? লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলে একশ টাকার মোট খুরখুর করে নিচে পড়তে থাকে? নাকি আমাকে দেখে মনে হয় আমি আদম ব্যাপারী? মানুষের বিজনেস করে এত টাকা কামিয়েছি যে, আপনার মুখ দেখে পাঁচশ টাকা দিয়ে দেব?

লোকটা সরু চোখে ছেট চাচার দিকে তাকিয়ে রইল আর ছেট চাচা সিনেমার ভিলেনের মত মুখ করে উঠে আসতে শূরু করলেন। খালেদ ছেট চাচার হাত জাপটে ধরে বলল, কি করছেন আপনি? কি করছেন? রাজি হয়ে যান।

আরে দাঁড়াও তো! দ্যাখ, এখনি ডাকবে।

সত্ত্বি সত্ত্বি আমরা দশ পাও যাই নি, লোকটা আবার ডাকল, শুনেন।

কি হল?

কত দেবেন?

পয়সাকড়ি কোথা থেকে দেব? জিনিসটা যদি খাঁটি হয় খবরের কাগজে আপনার নাম ধাম লেখা হবে, ছবি ছাপা হবে।

শুনে লোকটার মুখ কেমন জানি বিষণ্ণ হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল, খবরের কাগজে নাম দিয়ে কি আর পেট ভরে? নাকি সংসার চলে? ওসব আপনাদের ব্যাপার। আমার কোন নামের দরকার নাই, নাম আপনারাই নেন। আমি একটা দরকারি খবর দেই আপনারা কিছু সাহায্য করেন। চুরিচামারি তো করি না। স্বাধীন ব্যবসা করি।

ছেট চাচা চুপ করে বসে রইলেন। লোকটা বলল, ঠিক আছে, তিনশ টাকা দেন।

দুইশ।

আড়াইশ লোকটা যুখে একটু মিনতির ভাব করল, তখন ছেট চাচা রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, ঠিক আছে আড়াইশ।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলেন একটু চা খাই, গলাটা শুকিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে কথা বলি।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা একপাশে বসে থাকা একটা কালো মতল বাচ্চাকে ধমক দিয়ে বলল, হেই কাউলা, বস এখানে। খবরদার, পাঁচ টাকার কমে কোন নবযৌবন সালসা দিবি না।

কালো মতল ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, জ্ঞে, দেব না।

কে জানে সত্যিই ছেলেটার নাম কাউলা নাকি গায়ের রঙ কালো বলে ওকে কাউলা ডাকছে।

রেস্টুরেন্টে চা খেতে লোকটা যা বলল, তার সারমর্ম এরকম : মে নিজে এই হাড়টা যোগাড় করে নি। তার বড় শালা তাকে দিয়েছে। বান্দরবনের ভেতর দিয়ে একটা নদী ভেতরে চলে গেছে, নদীর নাম শঙ্খ নদী, স্থানীয় লোকজন বলে সাঙু। সেই নদী ধরে পুরো দিন পাহাড়ে উঠে গেলে একটা জায়গা আসে সেটার নাম ঝুমিয়া। জায়গাটা চেনার সহজ উপায় আছে, খুব সুন্দর একটা বরনা আছে সেখানে। সেই ঝুমিয়া থেকে দুই পাহাড়ের মাঝে দিয়ে ঝরনার স্রোতধারা বেয়ে প্রায় কুড়ি মাইল হেঁটে গেলে একটা হৃদ পাওয়া যায়। সেই হৃদের পানি নাকি আকাশের মত নীল। সেই হৃদের তিনি দিক পাহাড় দিয়ে ঢাকা, পাহাড়গুলি পাথরের, পাথরগুলির রঙ নাকি আগুনের মত। সেই পাথরের মাঝে নাকি নানারকম জন্তু জানোয়ারের হাড় ছড়ানো ছিটানো আছে। লোকটার বড় শালা শঙ্খ নদীতে নৌকা চালায়, মে একসময় গিয়েছিল। সেই এই হাড়টা এনে দিয়েছে। তার কাছে শুনেছে দৈত্যের মত বড় নাকি জন্তুর মাথা, তার বড় বড় দাঁত হাত দুই হাত লয়।

খালেদ নিশ্চাস বন্ধ করে শুনছিল, কথা শেষ হবার সাথে সাথেই জিজেস করল, আর কেউ কি জানে এটা সম্পর্কে? আর কেউ উৎসাহ দেখিয়েছে?

লোকটা বলল, মনে হয় খুব বেশি মানুষ জানে না। কেউ কোন উৎসাহও দেখায় নাই। কয়েকজন বিদেশী একবার একটু উৎসাহ দেখিয়েছিল কিন্তু আজকাল বিদেশীরাও খুব চালু হয়ে গেছে, হাত দিয়ে পয়সা গলতে চায় না।

খালেদ জানতে চাইল বান্দরবন কেমন করে যেতে হয়, থাকার জন্যে হোটেল আছে কি না। খাওয়ার ভাল রেস্টুরেন্ট আছে কি না।

লোকটা ভাল উত্তর দিতে পারল না, তবে তার বড় শালার নাম ঠিকানা লিখে দিল। মে স্থানীয় মানুষ, ভাল খোজখবর দিতে পারবে। দরকার পড়লে এক দু'যাত তার বাড়িতে থাকা কোন সমস্যা না। গরীব মানুষ কিন্তু আদর যত্ন ঠিকই করবে।

খালেদ তখনি তার নাম ঠিকানা লিখে নিল।

ছোট চাচা বাইরে এসে একটা গাছের নিচে বসে তখন একটা জরুরী মিটিং  
ডাকলেন। বললেন, কল্পবাজারে আমাদের হোটেলে রিজার্ভেশন করা আছে। আমাদের  
এখন সেখানে গিয়ে প্রথমে পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করা দরকার।  
দু'একদিন থেকে খোজখবর নিয়ে কিছু একটা করা যাবে।

খালেদ বলল, আপনি যান কল্পবাজার। আমি যাচ্ছি না।

ছোট চাচা রাগ চেপে বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বান্দরবন হয়ে ঝুমিয়া। সেখান থেকে টি-রেঞ্জের সন্দানে।

তুমি একা?

আর কেউ যদি না যায় তাহলে একা।

ছোট চাচা খাটি বাংলায় খালেদকে একটা গালি দিয়ে বললেন, তুমি একা  
বান্দরবনের পাহাড়ি জঙ্গলে যেতে পারবে?

আমি আমেরিকা থেকে একা চলে এসেছি।

আমেরিকা আর বান্দরবন এক জায়গা হল?

যে আমেরিকায় থাকতে পারে সে পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে।  
সেখানে প্রত্যেক তিন মিনিটে একটা মানুষ খুন হয়। পাঁচ মিনিটে — খালেদ হঠাৎ থেমে  
গেল।

পাঁচ মিনিটে কি?

নাহ। কিছু না।

তোমার বাবা যদি খবর পায়—

কিছু হবে না। খালেদ তার খোলাটা হাতে নিয়ে বলল, কে যাবে আমার সাথে?

আমার বুক ধুক ধুক করতে থাকে। দিনরাত বড়দের গালিগালাজ খেয়ে আমাদের  
মনটাই ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এই রকম সুযোগ তো আমি ছেড়ে দিতে পারি না।  
দাঁড়িয়ে বললাম, আমি যাব।

ছোট চাচা দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, টোপন, তোর মাথা যদি আমি চিবিয়ে না  
থাই।

রাজুও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও যাব।

ছোট চাচার মুখ রাগে থমথম করতে থাকে। কাঁপা হাতে তিনি আরেকটা সিগারেট  
ধরালেন। খালেদ নিচু গলায় বলল, সিগারেট খাওয়া আর মাথায় গুলি করার মাঝে  
কোন পার্থক্য নাই।

ছোট চাচা এত জোরে চিংকার করে বললেন ‘চুপ কর’ যে আশপাশের সব লোক  
ঘূরে তার দিকে তাকাল। গাছের ওপর দুইটা পাঁখি কিচমিচ করে ঝগড়া করছিল, ভয়  
পেয়ে সেগুলি উড়ে গেল হঠাৎ।

## ৫. ফ্রেডারিক সাহেব

বান্দরবনে যে বাসটা যায়, সেটি আসলে বাস নয়, একসময় সেটি ছিল একটা জীপ। এখন তার ওপরে নিচে মানুষের বসার জায়গা করায় সেটি একটি বিদ্যুটে জিনিসে পরিণত হয়েছে। আমরা বসেছি তার ছাদে। আমাদের এক পাশে একটা বস্তা বোবাই তাধাক, অন্য পাশে ঝাঁকা বোবাই মুরগি। এক পাশ থেকে আলকাতরার দুটি টিন ঝুলছে। যে বস্তাটায় হেলান দিয়ে বসেছি, গুরু থেকে বোবা যাচ্ছে সেটা আসলে শুটকির বস্তা। দেখে মনে হয়েছিল খুব বেশি হলে এখানে সাত আটজন মানুষ বসতে পারবে কিন্তু ওপরে নিচে মিলে প্রায় তিরিশজন মানুষ, তার মাঝে বেশ কয়েকজন চাকমা না হয় মগ। এতটুকু জায়গায় এতজন মানুষ কেমন করে বসেছে সেটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি, রাজু আর খালেদ এই গাড়িটার ছাদে। ছোট চাচা ভেতরে বসে আগে ফুলছেন। প্রথমে বলেছিলেন তিনি কঙ্গবাজার যাচ্ছেন, আমাদের যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি, জাহাঙ্গামে গেলেও তার কোন আপত্তি নাই বরং তিনি সেটা পছন্দই করবেন। যখন দেখিলেন আমরা সত্তি সত্তি বান্দরবনের দিকে রওনা দিচ্ছি তখন আমাদের সঙ্গে এসেছেন। যখন বাসায় ফিরে যাব তখন আমাদের কি অবস্থা হবে সেটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি দুশ্চিন্তা নেই। বাসার বড় মানুষেরা ছোট চাচার কি অবস্থা করবে সেটা চিন্তা করে বরং ছোট চাচার জন্য একটু দণ্ডহস্ত লাগছে।

বান্দরবনের রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর। আমি এর আগে কখনো এত সুন্দর রাস্তা দেখিনি। দুই পাশে পাহাড়, গাছগাছালি ঢাকা, মনে হয় কোথাও কোন মানুষ নেই, ইঠাং করে দেখা যায় কিছু পাহাড় মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তা এঁকেবেঁকে একবার ওপরে উঠে যাব একবার নিচে নেমে যায়। মাঝেমাঝেই পাহাড় এতটা খাড়া হয়ে যাব যে তখন গাড়ি আর নড়তে চায় না। সবাইকে নেমে তখন গাড়িটা ঠেলতে হয়। খালেদের তখন কী উৎসাহ! মাঝখানে ইঠাং এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়া করিয়ে হেলপার একটা বালতি নিয়ে ছুটে গেল। তারপর হড় খুলে রেডিয়েটরে পানি ঢেলে দেয়, টগবগ করে সেখানে পানি ফুটতে থাকে। খালেদের চোখেমুখে একটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি। আমাকে ফিসফিস করে বলল, মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি!

স্বপ্ন?

হ্যাঁ। কোনদিন কল্পনাও করি নাই এরকম একটা নির্জন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গাড়ির ছাদে বসে বসে যাব। এইরকম দৃশ্য, এইরকম অ্যাডভেঞ্চার! গল্পের বইয়েও তো এ রকম হয় না। হয়?

আমি কিছু না বলে চুপ করে রহিলাম, খালেদ আবার বলল, কী আশ্চর্য! আসলেই এটা হচ্ছে। আমার নিজের জীবনে! বিশ্বাস হয়?

রাজু ফিসফিস করে বলল, যখন বাসায় যাব যা একটা ঘার দেবে—

আরে ধূৰ ! ভুলে যা বাসার কথা !

বান্দরবনের রাস্তাটা অপূৰ্ব, কিন্তু শহুরটা এমন কিছু আহামৱি নয়। দেশের যে কোন মফঃস্বলের বাজারের মত। ছোট ছোট দোকানপাট। রাস্তাঘাটে ভিড়। তবে তুলনামূলকভাবে চাকমা, মগ এৱকম মানুষ বেশি। বিচিত্ৰ ভাষায় কথা বলছে, পোশাকও একটু অন্যরকম। শুকনো দড়ির মত মানুষটি আমাদের বলে দিয়েছিল বাজারের কাছ থেকেই সঙ্গু নদী কিন্তু কোন নদী আমরা খুজে পেলাম না। লোকটা কি ধোকা দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে? ছোট চাচা তাহলে মনে হয় লবণ ছিটিয়ে আমাদের কাঁচা ধৰে খেয়ে ফেলবেন।

আমরা বাজারের একজনকে জিজ্ঞেস কৱলাম, সঙ্গু নদীটা কোথায়? লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই তো পেছনে!

তাকিয়ে দেখি সত্যিই দোকানের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা নিচে নেমে গেছে। আমাদের বুকে বল ফিরে এল, হেঁটে নিচে নেমে আসতেই দেখি নদী। নদীৰ তীৰে এক পাশে অনেক মানুষের ঝটলা। দূৰ থেকে দেখতে পেলাম পাশাপাশি অনেকগুলো নৌকা তার মাঝে বড় বড় কাঠের বাল্ল তোলা হচ্ছে। এটা দেখার জন্যে এত ভিড় কেন বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি একজন সাদা চামড়াৰ বিদেশী মানুষ, তখন হঠাৎ করে ভিড়ের আসল কারণটা বুঝতে পারলাম। বিদেশী মানুষ দেখলে সবসময় ভিড় জমে যায়। আমি খালেদকে বললাম, মনে হয় তোমার দেশের মানুষ, যাও কথা বলে এসো!

খালেদ উত্তর না দিয়ে হাসল। বোঝাই যাচ্ছে তার কোন উৎসাহ নেই।

ছোট চাচা অবশ্যি খুব উৎসাহ নিয়ে হেঁটে গেলেন। বিদেশী দেখলেই ছোট চাচা এগিয়ে যান, তাঁৰ ধারণা এদেশে বিদেশীদের খুব অসুবিধে হয়, ছোট চাচা লেখাপড়া জানা মানুষ তাই গিয়ে তাদের সাহায্য কৱবেন।

আমরা আমাদের সেই শুকনো মানুষের বড় শালার খোঁজ কৱতে শুরু কৱলাম, নাম বলেছিলা তার বাহাউদ্দিন। মাঝিদের জিজ্ঞেস কৱতেই তারা চিনে ফেলল, মনে হয় এখানে সবই সবাইকে চেনে। তারা বলল, বাহাউদ্দিন মাঝি গত রাতে নৌকা নিয়ে পাহাড়ে গেছে। শুনে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, এৱকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে আমরা চিন্তা কৱিনি।

এতদূৰ এসে তো আৱ ফিরে যাওয়া যায় না, তাই ছোট চাচা এসে হৈ চৈ শুরু কৱাৱ আগেই আমরা খোঁজ খবৰ নেয়া শুরু কৱলাম, নৌকা কৱে একৱাত একদিন ওপৱে উঠে গেলে সত্যি সত্যি ঝুঁমিৱা নামে একটা জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে সত্যি পাহাড়ের ওপৱ থেকে ঝৱনার পানি এসে পড়ছে। কথা বলে ঘনে হল যে কোন মাঝিই আমাদের নৌকা কৱে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। কোথায় থাকব জানতে চাইলে একজন মাঝি হেসে বলল, নৌকায় থাকবেন।

কোথায় ঘুমুব?

[www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)

---



ନୌକାର !

ଖାଓୟା ଦାଓୟା ?

ଖାଓୟା ଦାଓୟାର ଅସୁବିଧେ କି ? ଆମରା ରାନ୍ନା କରବ ସେଟା ଥାବେନ । ସବ ନୌକାଯ ଚୁଲୋ ଆହେ, ଡେକ୍ଟି ପାତିଲ ଆହେ ।

ବାଥରୁମ ?

ମାଝି ହୋ ହୋ କରେ ହେମେ ବଲଲ, ଏତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଳ ଆହେ କି ଜଣେ ?

ଛେଟି ଚାଚା ତଥନୋ ସାହେବେର ପେଛନେ ଘୁରଘୁର କରାଛେ । ସାହେବ ମନେ ହଜ୍ଜେ ତାକେ ବେଶି ପାତା ଦିଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ତବୁ ତିନି ହାଲ ଛାଡ଼ିଲେନ ନା । ଆମରା ଅର ଛେଟି ଚାଚାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲାମ ନା, ନିଜେରାଇ ଏକଟା ନୌକା ଠିକ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗିଲାମ ।

ଆମରା ବାଚା ଛେଲେ ବଲେ ନୌକାର ମାଝିରା ଆମାଦେର ବେଶି ଓରହୁ ଦିଚ୍ଛିଲ ନା । ସଥଳ ଜାନତେ ପାରିଲ ସାଥେ ଏକଜନ ବଡ଼ ଘାନୁସ ଆହେ ତଥନ କଯେକଜନ ମାଝି ବେଶ ଉଂସାହ ନିଯେ ଏଗିଯେ ଏଲ । ତାରା ନିଜେରାଇ ଆଲାପ ଆଲୋଚନା କରେ ଏକଜନ ମାଝିକେ ଠିକ କରେ ଦିଲ । ଲୟା ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ହାଲକା ପାତଳା ଘାନୁସ, ହାସିଖୁଣି ଚେହାରା, ନାମ ମୁମଲିମ । ତାର କଥା ବୋକା ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ କଠିନ, ମନେ ହୟ ମେଖାନେ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ନଯ, ଏକେବାରେ ଆରାକାନେର ଭାଷାର ଟାନ ।

ମାଝିର ସାଥେ ଦରଦାମ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛିଲାମ କିନ୍ତୁ ଖାଲେଦେର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବେଶିଦୂର ଯାଓୟା ଗେଲ ନା । ମାଝି ଯତ ଚାଇଲ ଖାଲେଦ ଝପ କରେ ସେଟାତେହି ରାଜି ହୟେ ଗେଲ । ଆମରା ତଥନ ଆମାଦେର ଝୋଲାଝୁଲି ନିଯେ ନୌକାଯ ଉଠେ ପା ଛଡ଼ିଯେ ବସିଲାମ । ନୌକାର ମାଝିକେ କିଛୁ ଟାକା ଧରିଯେ ଦେଯା ହଲ, ମେ ଗେଲ ବାଜାର କରତେ, ଆଗାମୀ କଯେକଦିନେର ଜନ୍ୟ ଚାଲ ଡାଲ କିଛୁ କିଲେ ଆନବେ । ଆମରା ବଲେ ଦିଲାମ ବିସ୍କୁଟ କଲା ଏସବେ ଯେନ କିଲେ ଆନେ ।

ଆମାଦେର ମାଝେ ତଥନ କେମନି ଏକ ଧରନେର ସ୍ଫୃତିର ଭାବ ଏଦେ ଗେଛେ । ନୌକାର ବସେ ନଦୀର ପାନିତେ ପା ଭିଜିଯେ ହୈ ଛଲାଡ଼ କରଛି । ଆଶପାଶେ ଅନେକ ନୌକା । ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାଶେ ଖାଡ଼ା ପାହାଡ଼ । ମେଖାନେ ଦେଖି କିଛୁ ବାନର ଲାଫକୁଁଫ ଦିଛେ । ଭାଯଗାଟାର ନାମ ବାନ୍ଦରବନ ହେୟାର କାରଣ ତାହଲେ ମତି ଆହେ ! କିଛୁ ଲୋକ ଦେଖିଲାମ ନଦୀତେ ଗୋସଲ କରାଛେ, ଜାମା କାପଡ଼ ଖୁଲେ ଆମରା ଲାକିଯେ ପଡ଼ିବ କି ନା ଚିନ୍ତା କରିଛିଲାମ, ତଥନ ଦେଖିଲାମ ଛେଟି ଚାଚା ଫିରେ ଆସିଛେନ । ମୁଖେ ବେଶ ବଡ଼ ଏକଟା ହାସି ।

ଆମରା ନୌକା ଠିକ କରେ ନିଯେଛି ଦେଖେ ରାଗ କରବେଳ ଭେବେଛିଲାମ କିନ୍ତୁ ରାଗ କରିଲେନ ନା, ବରଂ ମନେ ହଲ ଏକଟୁ ଖୁଶିହି ହଲେନ । ନୌକାର ଗଲୁହିଯେ ପା ଝୁଲିଯେ ବସେ ଏକ ଗାଲ ହେସେ ବଲିଲେନ, ସାହେବେର ନାମ ଫ୍ରେଡ଼ାରିକ ମାୟାର । ବାଡ଼ି ନିଉଜାର୍ସି ।

ଆମି ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲାମ, କି କରାହେ ଏକଥାନେ ?

ତେଲ କୋମ୍ପାନିତେ କାଜ କରେ । ଏକନ । ଡିଲ କରାର ଜଣ୍ୟ ଏମେହେ ।

ଡିଲ ?

ହୁଯା । ତେଲ ଖୋଜାର ଜଣ୍ୟ ମାଟି ଖୁଡେ ଦେଖିତେ ହୟ ତୋ । ତାହି କରବେ ପାହାଡ଼ ।

ଓ ।

খালেদ জিঝেস করল, পাথর ড্রিল করার যন্ত্রপাতি কই?

যন্ত্রপাতি? আছে নিশ্চয়ই। এই দেখ না কর বাস্তু।

রাজু মাথা নাড়াল, উহু। ঐগুলি খালি বাস্তু। দেখ না এক নৌকায় কতগুলি বাস্তু তুলেছে। যন্ত্রপাতি হলে অনেক ভারী হত।

ছোট চাচা একটা ধমক দিয়ে বললেন, আজকাল কর রকম হাই টেক যন্ত্রপাতি বের হয়েছে, তুই কি জানিস?

খালেদ মাথা নেড়ে বলল, রাজু ঠিকই বলেছে। হাই টেক যন্ত্র দিয়ে কি আর পাথর ড্রিল করা যায়? পাথর ড্রিল করতে লাগে ভারী যন্ত্র।

ছোট চাচা হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, তাহলে কি লোকটা মিথ্যে কথা বলবে আমার সাথে?

আর কি বলেছে আপনাকে?

একেবারে গোমড়ামুখো মানুষ। প্রথমে তো কথাই বলতে চায় না। শেষে যখন বললাম আমরাও যাচ্ছি অ্যাডভেঞ্চারে, তখন হঠাৎ করে উৎসাহ দেখাল।

কি করল তখন?

যখন শুনল আমরা ডাইনোসোরের ফসিল খুঁজতে যাচ্ছি তখন একেবারে হকচকিয়ে গেল। মনে হয়, কল্পনাই করতে পারেনি যে আমরা এরকম একটা সাজ্জাতিক মিশনে যাচ্ছি। বারবার জিঝেস করল, কতজন যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, আমরা কে, কোথায় থাকি, কি করি, আমরা যে এখানে এসেছি, সেটা কারা জানে, আমাদের সাথে বন্দুক আছে কি না — এই রকম হাজার হাজার প্রশ্ন! মনে হল পারলে সেও আমাদের সাথে যায়। সাহেবের জাত তো, মনে হয় রক্ষের মাঝে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।

ছোট চাচার কথাবার্তা শুনে মনে হল অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে সাহেবকে ভড়কে দিয়ে খুব খুশি হয়ে ফিরে এসেছেন। শার্ট খুলে নৌকায় চিৎ হয়ে শুয়ে গুলগুল করে একটা গান গাইতে গাইতে বললেন, বাঞ্ছালি জাতটার সমস্যা একটাই। সেটা হচ্ছে পলিটিক্স। পলিটিক্সে সময় নষ্ট না করে যদি অন্য কোন কাজে মন দিত কোন দিন এই জাতি মাথা তুলে দাঁড়াত।

আমার খুব হিচে করল তাকে মনে করিয়ে দিই, দুমাসও হয়নি তার ইউনিভার্সিটিতে ইলেক্শান হল। ছোট চাচা সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দাঁড়িয়েছিলেন। ইলেকশনে হেরে মুখ চুল করে ফিরে এসে বলেছেন, পুরো ব্যাপারটা নাকি একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফল। এর মাঝে একই সাথে সি.আই.এ. এবং কে.জি.বি.-র হাত ছিল!

মাঝি কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে এল। ছোট চাচা গম্ভীর হয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করে বাজিরে নিয়ে বললেন, চল তাহলে রওনা দিই।

মাঝি নৌকাটাৰ দড়ি খুলে নিয়ে লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কি একটা বলল ঠিক বুকতে পাৰলাম না। শুধুমাত্ৰ আল্লাহৰ নামটা শনতে পেলাম। নিশ্চয় বলছে আল্লাহৰ নাম নিয়ে শুরু কৰছি। বড় চাচাৰ ঘটনাটাৰ পৰ থেকে আমাদেৱ আল্লাহৰ উপৰ বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। ওজু নাহি তবু মনে মনে তিনবাৰ কুলহ আল্লাহ পড়ে নিলাম।

আমোৱা নৌকা থেকেই দেখলাম নদীতীৰে ছেটি চাচাৰ সেই ক্ষেত্ৰীক সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেৱ দেখছেন। সাথে আৰেকজন মানুষ, গায়েৱ রং কুচকুচে কালো, দাঁতেৱ ফাঁকে একটা সিগাৱেট চেপে ধৰে রেখেছে। মানুষটিৰ পৰনে লাল লুঙ্গি। লাল রঞ্জেৱ লুঙ্গি হয় আমি জানতাম না।

আমোৱা যতক্ষণ না চলে গেলাম সাহেবে আৱ লাল রঞ্জেৱ লুঙ্গি পৰা কালো মানুষটি দাঁড়িয়ে রহিল। যখন আৱো দূৰে চলে গেলাম দেখলাম সাহেবটা বাইনোকুলাৰ বেৱ কৰে আমাদেৱ দেখতে লাগল। নিজে দেখে বাইনোকুলাৰটি দিল তাৰ সাথেৰ কালো মানুষটিকে, সে মানুষটিও চোখে বাইনোকুলাৰ লাগিয়ে আমাদেৱ দিকে তাকিয়ে রহিল। নিশ্চয়ই আমাদেৱ দেখছে, কিন্তু কেন দেখছে?

ঠিক জানি না কেন হঠাৎ কৰে আমোৱা মনে হল আমোৱা একটা অশ্বত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি। বুকেৱ মাঝে হঠাৎ কেন জানি কাঁপুনি দিয়ে একটা ভয়েৱ শিহৰণ বয়ে গেল।

## ৬. কাচু মিয়া

নৌকাটা একটা বাঁক ঘুৰতেই আমোৱা একেবাৱে হতবাক হয়ে গেলাম। কী অপূৰ্ব দৃশ্য! কী সুন্দৰ একটা নদী ঢঁকেবেকে চলে গেছে, দুই পাশে উচু পাহাড়, সেই পাহাড়ে ঘন জঙ্গল। বিকেলেৱ নৱম আলোতে যেন এক ধৰনেৱ রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নদীৰ পানিৰ ওপৰ হালকা কুয়াশা, চারদিকে সুমসাম নীৱবতা। সমস্ত প্ৰকৃতি যেন চুপ কৰে তাৰ সমস্ত সৌন্দৰ্য নিয়ে আমাদেৱ জন্যে অপেক্ষা কৰে আছে।

আমি একটা দীৰ্ঘশ্বাস ফেললাম। মনে হয় সাৱাটা জীবন আমি একটা অন্ধকাৰ দোতলা দালানেৱ ছেটি ছেটি খুপৰিৱ মাঝে বড় চাচা, জয়নাল চাচা আৱ সুন্দৰ চাচাৰ মত অৰ্থস্থিকৰ মানুষেৱ কাছাকাছি থেকে কাটিয়ে দিয়েছি। অথচ বাইৱেৱ পৃথিবী কত সুন্দৰ! মনে হয় আগেৱ জীবন ছেড়ে এখানে চলে আসি, একটা পাহাড়ে পাহাড়ি কিছু শিশুৰ সাথে জীবনটা কাটিয়ে দিই। কী না মজা হত তাহলে!

নৌকাটা ধীৱে ধীৱে এগিয়ে যেতে থাকে। বাঁশেৱ লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাঝি নৌকাটা নিয়ে যাচ্ছে। পানিতে শুধু ছলাং ছলাং শব্দ, আৱ কেন শব্দ নেই। আমোৱা কেউ কেন কথা বলছি না, কেন জানি মনে হতে থাকে, এখানে কেন কথা বলাৰ কথা নয়। কথা বললেই এই অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য, মায়াৰী নীৱবতা, আৱ কোমল রহস্যময়

অনুভূতির কোন ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা চুপ করে বসে রহলাম, ছেটিচাচা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বললেন, আহারে! কী সুন্দর! এখন যেরে গেলেও কোন দুঃখ নাই।

নৌকার মাঝি ছেট চাচার কথা শনে সাথা নাড়ুল, বড়বা ছেটদের অথবীন কথা শনে যে রকম সন্তুষ্ট সাথা নাড়ে দেভাবে।

আমরা নৌকায় বসে বসে অঙ্ককার নেমে আসতে দেখলাম। নৌকার মাঝি মুসলিম, যাকে আমরা মুসলিম ভাই বলে ডাকছি, আমাদের জিজ্ঞেস করল, খিদে লেগেছে নাকি ভাই?

ছেট চাচা উত্তর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ মাঝি, পেটের মাঝে তো চিকা বুক ডল মারছে, খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করলে?

মুসলিম ভাই বলল, এই তো সামনে থামিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করব। তার কথায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার টান খুব বেশি কিন্তু কয়েক ঘণ্টা তার সাথে কথা বলে আমরা এখন তার কথা মোটামুটি বুঝে ফেলি। খালেদ অবশ্যি একটা কথাও বুঝে না। বুঝবে সেরকম আশাও করি নি!

ছেট চাচা জিজ্ঞেস করলেন, সামনে কোথায় থামাবে?

নদীর পাশে একটা ছেট জায়গা আছে। সেখানে রাতে সব নৌকা জড়ে হয়ে রাত কাটায়। একটা ছেট ঘর আছে, মাঝিরা সেখানে গল্পগুজব করে, চা সিগারেট খায়। রাতে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে। সবাই এক সাথে থাকে যেন বিপদ আপদ না হয়।

কী রকম বিপদ আপদ?

মুসলিম ভাই উত্তর না দিয়ে বলল, কত রকম বিপদ আপদ আছে! রাত্রে নৌকা চালানো ঠিক না, পাহাড়ি নদী, কিছু বলা যায় না।

ছেট চাচা কোন কথা বললেন না, মনে হল একটু ঘাবড়ে গেছেন হঠাত করে।

মুসলিম ভাইরের কথাই সত্যি। আরেকটা বাঁক ঘূরতেই দেখি নদীর তীরে ছেট একটা ঝুপড়ির মত ঘর। তীরে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা। মাঝিরা রান্না চড়িয়েছে। নৌকার নৌকায় ছেট ছেট বাতি ঝুলছে মিটমিট করে।

মুসলিম ভাই নৌকা থামাতেই আমরা নৌকা থেকে নেমে গেলাম। হাত পা ছাড়িয়ে হাঁটাহাঁটি করে আমরা ঝুপড়ির ভেতরে গেলাম দেখার জন্যে। ভিতরে টিমটিম করে বাতি ঝুলছে, মাঝখানে একটা চুলোয় বড় কেতলিতে চা গরম হচ্ছে। মাঝিরা শব্দ করে চুমুক দিয়ে দিয়ে চা খাচ্ছে। ভিতরে সিগারেটের ধোয়া, তার মাঝে সবাই গল্পগুজব করছে।

ভিতরে সবাই আমদের জায়গা দিল। বসার কোন জায়গা নেই। মাটিতে পা ছাড়িয়ে বসতে হল। আমরা কে কোথায় যাচ্ছি সেটা নিয়ে দেখলাম সবার খুব কৌতুহল। ছেট চাচা সুযোগ পেয়ে ডাইনোসোর, ডাইনোসোরের ফসিল এই সব নিয়ে একটা মন্ত্র গল্প

কেন্দে বললেন।

উপস্থিত যারা আছে তার মাঝে বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল যারা এই জায়গাটির কথা শুনেছে। খুমিয়া থেকে উত্তরে ছোটু একটা স্নেতধারার পাশ দিয়ে কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে গেলে একটা পাহাড়ি হৃদ পাওয়া যায়। তার আশেপাশে সত্যিই নাকি ভয়ঙ্কর প্রাণীর দেহাবশেষ দেখা গেছে। হানীর মানুষ সেখানে যাই না, অনেকে মনে করে সেখানে সে ভয়ঙ্কর প্রাণী এখনো বেঁচে আছে। সবাই সেটাকে বলে পাহাড়ি দানো।

গল্প শুনে আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। রাজু ফিসফিস করে বলল, সত্য কি পাহাড়ি দানো আছে?

খালেদ মাথা নেড়ে বলল, মনে হয় না। আমরা যে হাড়টা দেখেছি, সেটা ফসিল। ফসিল তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে। এই প্রাণী পূর্যবর্তী মিলিয়ন বছর আগে শেষ হয়ে গেছে।

আমরা খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে একটু হাঁটাহাঁটি করে ফিরে এলাম নৌকোয়। মুসলিম ভাই রান্না চাপিরেছে। কী চমৎকার স্বাগ বের হচ্ছে, জিবে একেবারে পানি এসে গেল। ছইয়ের মাঝে হেলান দিয়ে ছোট চাচা আয়েস করে বললেন, এটাকে বলে বেঁচে থাকা! কি বলিস তোরা?

আমরা সবাই মাথা নেড়ে বলল, আপনি তো আসতেই চাচ্ছিলেন না!

ছোট চাচা না শোনার ভাল করে গভীর হয়ে বললেন, প্রকৃতির কাছাকাছি যে জীবন, সে হচ্ছে সত্যিকার জীবন। তারপর গভীর হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন, আবার আসিব ফিরে . . .

ছোট চাচার ভাব এসে গেলে ভারি মুশকিল।

মুসলিম ভাই কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের ভাত বেড়ে দিল। ভাত এবং ডাল, এর আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই। না একটু সব্জি, মাছ, ডিম, আলু — কিছু না। সেটা যে অস্বাভাবিক হতে পারে সেটাও মুসলিম ভাইয়ের চোখে পড়ছে না। আমি বুঝতে পারলাম, অসন্তুষ্ট গরিব মানুষ এই নৌকোর মাঝিরা, তারা হয়তো জানেও না ডাল এবং ভাত ছাড়াও আরো কিছু খাওয়া যাই।

শুধু ডাল এবং ভাত, কিন্তু খেতে কী যে ভাল লাগেল তা আর বলার নয়। হাত দিয়ে যাখিয়ে গপাগপ করে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম আমরা। ছোট চাচা খাওয়া শেষ করে একটা ঢেকুর তুলে বললেন, এই হচ্ছে সত্যিকার জীবন।

খাওয়ার পর নৌকার ছইয়ে হেলান দিয়ে ছোট চাচা খালেদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সাবধানে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, খুব ভাল রান্না করেছ মাঝি।

মুসলিম ভাই একটু হেসে কি একটা বলল। ছোট চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন,

এতো সুন্দর জাগৰা, লোকজন বেড়াতে আসে ?

জে না । মাঝেমধ্যে কেউ একজন আসে ।

বিদেশী লোকজন আসে ?

জে না । আগে কখনো দেখি নাই ।

এই যে দেখলাম একজন ।

এই প্রথম দেখলাম । মুসলিম ভাই শুরু কুচকে জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছে জানেন ?

তেল খুজতে এসেছে । মাটির নিচে তেল থাকে । যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই তেল খুজে বের করে ।

মুসলিম ভাই অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, জে না । আমার বিশ্বাস হয় না । অন্য বদ মতলব আছে ।

ছোট চাচা অবাক হয়ে বললেন, সে কী ! বদ মতলব থাকবে কেন ?

জে, আছে বদ মতলব ।

কেমন করে জান তুমি ?

সাহেবের সাথে লাল লুঙ্গি পরা একজন মানুষ দেখেছিলেন কালো মতন ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ই�্যাং দেখেছি । সাহেবের সাথে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল ।

তার নাম কাচু মিয়া ।

কি হয়েছে কাচু মিয়ার ?

কাচু মিয়া হচ্ছে এই এলাকার বদমানুষ । খুন খারাপির মানুষ । টাকা দিলে গলা নামিয়ে দেয় । এই মানুষকে যেখানে দেখবেন, বুঝবেন সেখানে গোলমাল আছে । খুন খারাপি আছে ।

মুসলিম ভাইয়ের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম । আমার মনে পড়ে গেল নদী তীরে দাঁড়িয়ে সাহেব আর কাচু মিয়া বাইনোকুলার দিয়ে আমাদের দেখছিল । তাহলে কি আমাদের নিয়ে কোন বদমতলব আছে ? আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম । তার আগেই ছোট চাচা বললেন, আরে ধূর ! কি বলছ মাঝি !

জে, ঠিক বলছি । সাহেবের সাথে কাচু মিয়াকে দেখলাম । তার নিশানা ভাল না । অনেক বড় বদ মতলব এই সাহেবের ।

ছোট চাচা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে কি বলছ তুমি ? এরা কত বড় জাতি ! কত বড় এদের মন ! কত বড় এদের ডেমোক্রেসি ! আমি নিজে সাহেবের সাথে কথা বলেছি । কী মাইডিয়ার মানুষ !

সাহেবের কথা চিন্তা করেই ছোট চাচার মুখে একটা স্পিত হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু আমার পেটের ভেতরে হঠাৎ কেমন জানি পাক খেয়ে ওঠে ।

ରାତେ ଘୁମାନୋ ନିଯେ ଏକଟୁ ଦମଦ୍ୟା ହଲ, ସବାହିକେ ନିଯେ ଆରାମ କରେ ଶୋରାର ଜଣେ ନୌକୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ନା । ଆମି ଆର ଖାଲେଦ ଏକ ପାଶେ ଶୁଯେଛି, ମାଝଥାନେ ଛୋଟ ଚାଚା ଆର ରାଜୁ, ଅନ୍ୟ ପାଶେ ନୌକୋର ଗଲୁହିରେ ଗୁଡ଼ିସୁଟି ମେରେ ଶୁଯେଛେ ଶୁନିଲିମ ଭାହି । ଛୋଟ ଚାଚାର ପା ଆମାଦେର ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେ ଏମେହେ ଆର ମେହେ ପାଯେ ମେ କି ବିଦୟୁଟେ ଗନ୍ଧ !

ରାତେ ନୌକାଯ ଶୁଯେ ନୌକୋର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୁଲୁନିତେ ଘୁମାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲାମ । ଆରୋ ନୌକୋ ଏମେ ଥାମଛେ ଆଶେପାଶେ, ଶୁଯେ ଥେକେଇ ଆମରା ଟେର ପାଞ୍ଜି । ବେଳ ଗାଡ଼ିର ଯେ ରକମ ଜଂଶନ ଥାକେ, ଏଟାଓ ନିଶ୍ଚର ମେ ରକମ ନୌକାର ଜଂଶନ ।

ଶୁଯେ ଶୁଯେ ଘୁମାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଥାକି କିନ୍ତୁ ଏତ ସହଜେ ଚୋଥେ ଘୁମ ଆସତେ ଚାଯ ନା । ମନେ ହଚିଲ ବୁଝି କଥନୋହି ଘୁମ ଆସବେ ନା କିନ୍ତୁ ଏକ ସମସ୍ୟ ମତି ଚୋଥେ ଘୁମ ନେମେ ଏଲ । ଛାଡ଼ାଛାଡ଼ା ଭାବେ ଘୁମାଛି ହଠାତ୍ ଦେଖି ଖାଲେଦ ଉଠେ ବମେହେ । ଆମି ଆଥେ ଘୁମେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ, କି ହୁଯେଛେ ?

ବାଥରୁମ ପେରେଛେ ।

ଛୋଟ ବାଥରୁମ ନା ବଡ଼ ବାଥରୁମ ?

ଛୋଟ ବାଥରୁମ ।

ନୌକୋର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେ କରେ ଫେଲ ।

ଧୂର ! ନିଚେ ନେମେ କରେ ଆସି । ତୁମି ଆସବେ ଏକଟୁ ? ଭୟ ଭୟ କରେ ।

ଚଲ । ଅନ୍ଧକାରେ ହାତଡ଼େ ହାତଡ଼େ ଆମି ଆର ଖାଲେଦ ନୌକା ଥେମେ ନେମେ ଏଲାମ । ଖାଲେଦେର ଲଜ୍ଜାଶରମ ବା ବ୍ୟାସ୍ତ୍ୟଙ୍ଗନ ମନେ ହ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଶଜନ ମାନୁଷ ଥେକେ ଏକଟୁ ବୈଶି । ଏକଟା ଗାଛେର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେ କାଜ ମେରେ ଫେଲତେ ଅନୁବିଧେ କି, କିନ୍ତୁ ମେ ଏକେବାରେ ଜଙ୍ଗଲେର ମାରେ ଢୁକେ ଗେଲ । ଆମି ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛି । ହଠାତ୍ ମନେ ହଲ ଦୁଇଜନ ମାନୁଷ ଏକେବାରେ ଅନ୍ଧକାର ଫୁଲ୍ଡେ ବେବେ ହେଁୟେ ଏଲ । ଆମି ଭୟେ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍କାର କରେ ଉଠିଛିଲାମ, କୋନମତେ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଯେ ଗାଛେର ଆଡ଼ାଲେ ମରେ ଗେଲାମ । ମାନୁଷ ଦୁଇଜନ ଆମାକେ ଦେଖେଲି । ଗାଛେର ନିଚେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଏକଟା ସିଗାରେଟ ଧରାଲ ଆର ଆମି ମ୍ୟାଚେର ଆଲୋତେ ମାନୁଷଟାକେ ଚିନ୍ତତେ ପାରି, କାଚୁ ମିଯା ।

ଆମାର ବୁକଟା ଧ୍ୱବକ କରେ ଓଠେ । ନିଜେକେ ଲୁକିଯେ ରୋଖେ ନିଶ୍ଚାସ ବନ୍ଧ କରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକି । କାଚୁ ମିଯା ସିଗାରେଟେର ଧୋଯା ଛେଡେ ବଲଲ, କୋନ ନୌକା ?

ମାଥେର ଅନ୍ୟ ମାନୁଷଟା ବଲଲ, ଦକ୍ଷିଣେ ଦୂହଟା ଛେଡେ ତିନ ନମ୍ବରଟା ।

ଆମି ଆତକ୍ଷେ ଶିଉରେ ଉଠିଲାମ, ମେଟା ଆମାଦେର ନୌକା !

ଠିକ ଜାନ ?

ଜେ । ଦେଖେ ଏମେଛି । ତିନଙ୍ଗନ ଛେଲେ, ଏକଙ୍ଗନ ବଡ଼ ମାନୁଷ । ମାଥେ ମାଝି ।

ତା । ଶାଲାର ଫେଡ୍ୟେର ବାଚା । କାଚୁ ମିଯା ଅନୁଭବ ମୁଖ ଖାରାପ କରେ ଆମାଦେର ଗାନ୍ଧି ଦିଯେ ବଲଲ, ପାହାଡ଼ି ଦାନୋର ହାଙ୍ଗି ନେବେ ଆମାଦେର ଆଗେ, କତ ବଡ଼ ସାହସ !

କତ ବଡ଼ ସାହସ ! ଅନ୍ୟ ଲୋକଟା ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଅନୁଚରେର ଭତ ମାଥା ନାଡ଼େ ।

ଚଲ । ଛେଲେ ତିନଟାରେ ଛେଡେ ଦେବ । ବଡ଼ଟାର ଗଲଟା ନାମିଯେ ଦିଯେ ଆସି ।

এখনই কাচু ভাই ?

তাহলে কখন ?

আরেকটু রাত হোক । লোকজন এখন জাগা ।

জাগাই তো ভল । কাচু মিয়া গভীর গলায় বলল, কাচু মিয়ার হাতের কাজ তো  
লোকজন জেগেই দেখবে ! কাচু মিয়া কি কড়িকে ভয় পায় ?

আমি আবছা অঙ্ককারে দেখলাম, কাচু মিয়া তার বগল থেকে একটা দা বের করে  
তার উপরে আঙুল বুলিয়ে তার ধারটা পরীক্ষা করে মুখ দিয়ে একটা খুব সন্তুষ্টির ফত  
শব্দ করল । অন্য লোকটি বলল, আগে এক কাপ চা খেয়ে আসি চলেন ।

কাজের সময় কাজ । খাওয়ার সময় খাওয়া ।

এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে । ফ্রেস পান্ডির গরম চা । সাদা চিনি ।

কাচু মিয়া একটু নরম হল মনে হল । জিজ্ঞেস করল, এত রাতে চা কি আছে ?

জে, আছে ।

চল তাহলে ।

কাচু মিয়া আর তার সঙ্গী দুজন হেঁটে হেঁটে ঝুপড়ির দিকে এগিয়ে গেল । ভয়ে  
আতঙ্কে আমার হাদ্দিপন্দন থেমে গেছে, কেনমতে চাপা গলার ডাকলাম, খালেদ !

খালেদ জঙ্গল থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ?

আমি ফিসফিস করে বললাম, তাড়াতাড়ি চল নৌকায় । সর্বনাশ !

কী হয়েছে ?

কাচু মিয়া এত বড় একটা দা নিয়ে এসেছে, ছেঁট চাচাকে মারবে ।

সত্যি ?

হ্যাঁ, নৌকায় চল । আমি আর খালেদ ছুটতে ছুটতে নৌকায় এসে ছেঁট চাচাকে  
তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ছেঁট চাচা গভীর ঘূমে অচেতন হয়ে আছেন । দু একবার  
ধাক্কা দেয়ার পর ঘূমের মাঝে বিড়বিড় করে বললেন, স্বেরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা  
গণতন্ত্রের পরিপন্থী . . .

মুসলিম ভাই আর রাজু ঘূম থেকে জেগে উঠেছে । মুসলিম ভাই জিজ্ঞেস করল,  
কি হয়েছে ?

কাচু মিয়া আমাদের খুঁজছে । ছেঁট চাচাকে কেটে ফেলবে । হাতে এই বড় একটা  
দা ।

কোথায় ?

এখন চা খেতে গেছে ।

মুসলিম ভাই লাফ দিয়ে উঠে বসে নৌকার ছাই থেকে টেনে কি একটা জিনিস বের  
করল । আমরা দেখলাম একটা বর্ণা । হাতে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কোন ভয় নাই ।  
আমি আছি ।

মুসলিম ভাইয়ের শক্ত শরীর, কঠোর মুখ আর এরকম একটা বর্ণা দেখে হঠাৎ

আমরা বুঝতে পারি এই মানুষটা সত্যি আমাদের রক্ষা করবে। একটু আগে যে রকম আতঙ্কে হাত পা শীতল হয়ে যাচ্ছিল সেটা কনে গিয়ে এখন এক ধরনের উদ্দেশ্যনা হতে থাকে। মুসলিম ভাই দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেল। একটু পরে দেখি মুসলিম ভাই নৌকা খুলে দিয়েছে। প্রোত্তের টানে নৌকা ভেনে যাচ্ছে নিঃশব্দে। বেশ খানিকক্ষণ পরে মুসলিম ভাই ভেজা কাপড়ে নৌকায় উঠে বসল, নৌকা নিঃশব্দে অঙ্ককারে ভেসে যেতে থাকে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, কোথায় যাও মুসলিম ভাই?

সরে যাই। কাছে একটা জারগা আছে, গাছপালায় ঢাকা। কারো সাধি নেই সেখানে আমাদের খুঁজে পাবে।

শুনলাম ছেট চাচা আবার বিড়বিড় করে শোষণহীন শাসন ব্যবস্থা আব গণতন্ত্র নিয়ে কি একটা কথা বলে আবার পাশ ফিরে ঘূমিয়ে গেলেন। আমরা তাকে আব ঘাটালাম না। মুসলিম ভাই প্রায় নিঃশব্দে নৌকাটাকে নিয়ে গাছপালা ঢাকা একটা জায়গায় হাজির হল। সেখানে সাবধানে নৌকাটাকে লুকিয়ে ফেলে বলল, আব কোন ভয় নাই।

সত্যি?

হ্যাঁ, কারো বাবার সাধি নাই আমাদের খুঁজে বের করে। আব আমি তো আছি। কাচু মিয়া যদি আসে, এই বর্ষা দিয়ে তাকে এফোড় ওফোড় করে দেব। ইবলিশের বাচ্চা!

কাচু মিয়া গামছা দিয়ে তার ভেজা শরীর মুছে নিচ্ছিল। আমি বললাম, তোমার ভেজা কাপড় বদলাবে না?

মুসলিম ভাই হেসে বলল, এই তো, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে।

আমি বুঝতে পারলাম তার আব কোন কাপড় নেই।

আমি, খালেদ আব রাজু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রাতজাগা নানারকম পাখি আব জল্পুর ডাক শুনতে শুনতে এক সময় সত্যি সত্যি ঘূমিয়ে গেলাম।

## ৭. থোয়াৎসা চাই

খুব ভোরে ছেট চাচা আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তাঁর চোখে মুখে আতঙ্ক, ফিসফিস করে কাঁপা গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি ওঠ সবাই। মহাবিপদ।

আমি লাফিয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

সর্বনাশ হয়েছে।

কি সর্বনাশ?

বাহিরে তাকিয়ে দ্যাখ নৌকা কোথায় এনে রেখেছে। একটা জঙ্গলের ভেতরে। এই

মাঝি আসলে ভাকাত, নৌকেটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে তার দলের অন্য লোককে ডেকে আনতে গেছে। এখন আমাদের সবাইকে কেটে ভাসিয়ে দেবে।

আমি ছোট চাচাকে থামলাম, বললাম, ভয় পাবেন না ছোট চাচা। কেটে আমাদের ভাসাত না, ভাসাত আপনাকে। আর সেটা কে করত জানেন? মুসলিম ভাই না, আপনার প্রাণের বন্ধু ফ্রেডারিক সাহেবের ডান হাত কাচু মিয়া। মুসলিম ভাই না থাকলে কাল রাতে আমরা গিয়েছিলাম।

কেন? কি হয়েছে?

আমরা তখন ছোট চাচাকে গত রাতের পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। শুনে ছোট চাচা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ লাগল তাঁর শান্ত হতে। তখন তিনি তাঁর ভয়টা ঢেকে ফেলার জন্য খুব রেগে যাবার ভান করলেন। চোখ লাল করে বললেন, আমাকে ডাকলি না কেন?

ডেকেছি ছোট চাচা। অনেক ডেকেছি। আপনি উঠেন নাই।

খালেদ বলল, পলিটিন্স নিয়ে একটা লেকচার দিলে।

ছোট চাচা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোদের কথা শুনে এখানে আসাই ভুল হয়েছে। আরেকটু হলে জানটা যেত। এখুনি ফিরে যাব।

খালেদ বলল, এই বদমাইস সাহেব এসেছে ফসিলের খোজে। সব ভেঙে নিয়ে যাবে।

যাক। ব্যাটার কাছে কত রকম বন্দুক আছে, গুলি করে শেষ করে দেবে। এখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাই।

আমরা কেউ কেন কথা বললাম না।

কোথায় মাঝি? ডেকে আন।

খালেদ একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, কাচু মিয়া বলেছে তোমাকে কেটে ফেলবে। আমাদের কিছু করবে না।

তার মানে?

তোমার যদি ভয় করে তুমি চলে যাও। আমরা তিনজন জয়গাটা দেখে আসি।

ছোট চাচা চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন, রাগে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। শেষে যখন কিছু একটা বলতে গেলেন, তখন দেখলাম মুসলিম ভাই হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর মুসলিম ভাই? কোথায় গিয়েছিলে?

একটু দেখে এলাম।

কি দেখে এলে?

কাচু মিয়াকে।

কি করে কাচু মিয়া?

নদীর ঘাটে বসেছিল তার সাগরেদকে নিয়ে। সবগুলি নৌকায় আপনাদের খুঁজছে।

ছোট চাচা ঢোখ বড় বড় করে বললেন, শুনলি? শুনলি? এখন যখন আমাদের দেখবে, কপ করে গলাটা কেটে ফেলে দেবে।

মুসলিম ভাই বলল, আমি একটা কাজ করোছি।

কি কাজ?

পরিচিত একজন মাঝিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি যে, কাল রাতে আপনাদের একজনের খুব শরীর খারাপ হয়েছে, দাস্ত আর বমি। তাই আপনারা তাড়াতাড়ি ফিরে গেছেন।

তাই নাকি?

হ্যা, দেখলাম খবরটা কাছু মিয়ার কানে গেছে। তখন সে খুব খুশি হয়ে তার নৌকায় শুয়ে একটা ঘুম দিচ্ছে। আর সে আপনাদের খুঁজবে না।

খালেদ হাতে কিল দিয়ে বলল, ভেরি গুড়।

মুসলিম ভাই বলল, সাহেব তার অন্য লোকজন নিয়ে সকালে রওনা দেবে। যাবার সময় এখান থেকে কাছু মিয়াকে তুলে নেবে।

আমি বললাম, সাহেব পৌছানোর আগে আমাদের পৌছাতে হবে।

মুসলিম ভাই মাথা নড়ল, বলল, এখন আমরা লুকিয়ে চলে যেতে পারি কিন্তু যদি কাছু মিয়া দেখে ফেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে।

আমি বললাম, আমরা নৌকার একেবারে ভেতরে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকব।

মুসলিম ভাই বলল, আপনারা আরেকটা কাজ করেন।

কি কাজ?

নদীটা এই পাহাড়কে ঘূরে গেছে। আপনারা এই পাহাড়টা হেঁটে হেঁটে পার হয়ে আসেন। আমি অন্য পাশে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করব। আমি একা খালি নৌকা চালিয়ে যাব, কাছু মিয়া যদি দেখেও ফেলে কোন সন্দেহ করবে না।

ছোট চাচা খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, না, সেটা কেমন করে হয়? মাথা খারাপ নাকি? এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক না—

মুসলিম ভাই মাথা নেড়ে বলল, আপনি ভয় পাবেন না সাহেব। আমি আছি। এই খোদার নামে কীরা কেটে বলছি, আমি বেঁচে থাকতে কেউ আপনাদের কিছু করতে পারবে না। আল্লাহর কসম।

ছোট চাচা আপনি তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে আমরা এক লাফে নৌকা থেকে নেমে গেছি।

মুসলিম ভাই বলল, নৌকো থামিয়ে আমি রান্না শুরু করে দেব। কালকে শুধু ডাল দিয়ে থেতে আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে। আজকে যাহের ব্যবস্থা করব।

ছোট চাচা গঞ্জীর মুখে বললেন, মাঝি, তুমি এখনো খাবার কথা ভাবছ?

মুসলিম ভাই হেসে বলল, সাহেব, বিপদ আপদ যতই আসুক থেতে তো হয়। সকালে নাশতার ব্যবস্থা করতে পারি নাই, এই যে নেন মুড়ি আর গুড়।

মুসলিম ভাই একটা ছোঁড়া ধরিয়ে দিল।

আমি মূড়ির ছোঁড়া নিয়ে জঙ্গল ডেঙে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছি। আমার পেছনে খালেদ আর রাজু। সবার পেছনে ছোঁট চাচ। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি তাকে জোর করে খানিকটা আলকাতরা খাইয়ে দিয়েছে। তার মুখ খুব বিমর্শ। চোখের কোণে কালি। শেভ করেননি বলে গালে খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি।

মূড়ি খেতে খেতে আমরা হাঁটছি। জঙ্গলের মাঝে দিয়ে আমরা আগে কখনো হাঁটিনি। ব্যাপারটা এত সোজা না। তাছাড়া পাহাড়টা ওপরে উঠে গেছে। সমান জায়গায় খুব সহজে হাঁটা যায়, কিন্তু ওপরে উঠতে হলে খুব সহজেই দয় ফুরিয়ে যায়। আমাদের একটু পরে পরেই থেমে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। হাঁটার কোন পথ নেই, পা ফেলার কোন জায়গা নেই। ঘন জঙ্গল গাছ আর লতাপাতায় ঢাকা, সেই সব গাছের ডালপালা চোখে মুখে লেগে যায়। কে জানে সাপ খোপ আছে নাকি। বিছুটি গাছ যদি থাকে তাহলে কি হবে? কষ্ট হচ্ছিল খুব কিন্তু আবার কেমন জানি মজাও লাগছিল আমাদের। মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি যাচ্ছি সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চারে। মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি সেই মুক্তিযোদ্ধাদের মত, যাচ্ছি সত্যিকারের কোন অভিযানে।

একটু পর আমরা মোটামুটি সমতল জায়গায় এসে পৌছুলাম। ছোঁট চাচ পেছন থেকে বললেন, দেখি আমি সামনে দিয়ে যাই। তোরা শুধু শুধু দেরি করছিস।

আমরা তাকে সামনে যেতে দিলাম। ছোঁট চাচ একটা শুকনো ডাল হাতে তুলে নিয়ে সেটা ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে মিনিট দশক গিয়েছি, ঠিক তখন আমার জীবনের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটল, দেখলাম, হঠাৎ করে ছোঁট চাচ আঁ-আঁ-আঁ শব্দ করে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে দুই পা ওপরে তুলে শূন্যে উঠে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি উল্টো হয়ে একটা গাছ থেকে ঝুলছেন। ব্যাপারটি এত বিচ্ছিন্ন, আমাদের বেশ খানিকক্ষণ লাগল ব্যাপারটি বুঝতে। আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। বোঝার চেষ্টা করছি কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। হঠাৎ করে শুনলাম কে যেন হি হি করে হেসে উঠল। সে হাসি কিছুতেই থামে না। একেবারে বাচ্চার গলার হাসি, প্রায় মেয়েদের হাসির মত। আমরা ঘূরে ফিরে তাকালাম, হঠাৎ দেখি একটা গাছের আড়াল থেকে বারো তৰো বছরের একটা ছেলে বের হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে হাসতে হাসতে তার পেট ফেটে যাবে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে একবার ছোঁট চাচকে দেখায়, তারপর আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। হাসি জিনিসটা সংক্রামক, ছেলেটাকে এভাবে হাসতে দেখে আমরা হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটার হাস্যকর দিকটা দেখতে পারলাম। একজন বয়স্ক মানুষ দুই পা ওপরে দিয়ে একটা গাছ থেকে ঝুলছে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। আমরাও হাসতে শুরু করেছি তখন ছোঁট চাচ বাঘের মত একটা গর্জন করলেন, জানে মেরে ফেলব সব কয়টাকে।

বাচ্চা ছেলেটা, যার খালি গা, খালি পা, পরনে ছোঁট একটা কাপড় এবং কোমর

থেকে তার সমান একটা ধারালো রাম দা ঝুলছে। এবাবে হাসি খামিয়ে তার সেই ভয়ংকর রাম দা বের করে কোথায় একটা কোপ দিল, সাথে সাথে একটা দড়ি ছিড়ে ছেট চাচা ছড়মুড় করে নিচে একটা ঘোপের মাঝে এসে পড়লেন। আমরা দেখলাম, তাঁর পুরো শরীর ঘোপের মাঝে অদ্রশ্য হয়ে গেছে, শুধু তার পা দুটি দেখা যাচ্ছে।

ছেলেটা সেটা দেখে আবাব হি হি করে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

আমাদেরও সাংঘাতিক হাসি পাছিল কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, এখন হয়তো হাসতা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা ঘোপের কাছে এগিয়ে গেলাম, দেখলাম, ছেট চাচা এর মাঝে সামলে সুমলে বের হয়ে এসেছেন। কপালের খানিকটা ছাল উঠে গেছে, শাটের পকেটটা ছিড়ে ঝুলছে, গা হাত পায়ে ইতস্তত কাটাকুটি। আমি ভয়ে ভয়ে জিঞ্জেস করলাম, ছেট চাচা, ব্যথা পেয়েছে নাকি?

না। ছেট চাচা মুখ খিচিয়ে বললেন, খুব আরাম লেগেছে, অসম্ভব আরাম লেগেছে। এখনও আরাম লাগছে!

এবাবে তিনি খালি গায়ের ছেলেটার দিকে তাকালেন। তার হাতে যদি এত বড় রাম দাটা না থাকত, আমি নিঃসন্দেহ যে তিনি ছেলেটার কান মুচড়ে একটা ডাবল সাইজ চড় কসতেন।

খালেদ ছেলেটাকে জিঞ্জেস করল, এটা কি? কেমন করে হল এটা?

প্রথমে বাংলায়, ছেলেটা কিছু বুঝল না, তখন ইংরেজিতে জিঞ্জেস করল, তাতেও লাভ হল না। তারপর পৃথিবীর আদি ভাষায়, আকার ইঙ্গিত এবং চোখের দৃষ্টি দিয়ে— ছেলেটা এবাবে চট করে প্রশ্নটা বুঝে যায়।

সে আমাদের একটা ঘোপের কাছে নিয়ে দেখাল, পুরো জিনিসটা শেয়াল, হরিণ বা বুনো শূকর ধরার একটা ফাঁদ। গাছের একটা ডাল নুইয়ে সেখানে দড়ি বেঁধে একটা ফাঁস তৈরি করা হয়, গাছের ছেট একটা ডাল দিয়ে সেটা আটকে রাখা হয়। দড়ির ফাঁসে পা দিতেই ছেট ডালটা সরে গিয়ে ফাঁসটা পায়ে আটকে যায়, নুয়ে থাকা গাছটি ছিটকে উপরে উঠে যায় আর সাথে সাথে প্রাণিটি শূন্য থেকে ঝুলতে থাকে। এটা জন্তু জানোয়ার ধরার ফাঁদ। ছেট চাচা তার এই ফাঁদে পা দেবেন সেটা সে কখনো সন্দেহ করেনি।

ছেলেটা বাংলা বোঝে না জানার পর ছেট চাচা দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, জংলী ভূত। বেয়াদব। এক চড় মেরে সবগুলি দাঁত ফেলে দেওয়া দরকার। শিক্ষা দীক্ষা নেই, মানসম্মান জ্ঞান নেই—

আমি বললাম, কেন, রাগ করছেন ছেট চাচা? সে কি আর আপনার জন্যে এটা পেতে রেখেছিল? আপনি ভুল করে পা দিয়েছিলেন বলেই তো—

তাই বলে এভাবে হাসবে? এটা হাসি তামাশার জিনিস হল?

ছেট চাচা, আপনি যদি দেখতেন, তাহলে আপনিও হাসতেন! একজন বয়স্ক মানুষ উল্টো হয়ে ঝুলছে—

আমি হাসি শুরু করে দিচ্ছিলাম, কিন্তু ছোট চাচার মুখ দেখে আর সাহস হল না। তিনি ঘাড়টা বাঁকা করে এক জায়গায় বেশ জোরে জোরে মালিশ করে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছে। কারো ব্যথা লাগলে সেটা নিয়ে তো আর হাসা যায় না!

এদিকে মনে হচ্ছে খালেদ আর রাজুর সাথে ছেলেটার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। হাত নেড়ে, চোখ বড় করে, শরীর বাঁকিয়ে অনেক রকম ভাবের আদান প্রদান হয়ে যাচ্ছে। আমিও গিরে ঘোগ দিলাম।

খালেদ হাত বাঁকিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলল, খালেদ।

ছেলেটা, যার নাকটা একটু চাপা, ঘাড় পর্বত লম্বা চূল, একেবারে গোলাপী গারের রঙ এবং গ্রীক দেবতাদের মত সুঠাম শরীর, নিজেকে দেখিয়ে বলল, খোয়াংসা চাই।

খোয়াংসা চাই? তোমার নাম?

ছেলেটা মাথা নাড়ল। রাজুর দিকে আঙুল দেখিয়ে তার নাম জানতে চাইল। রাজু বলল, রাজু।

আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, আমি বললাম টোপন।

টোপন? ছেলেটা আবার পেটে হাত দিয়ে হি হি করে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে। টোপন নামটাতে এত হাসির কি থাকতে পারে, আমরা বুঝতে পারলাম না।

খোয়াংসা চাইয়ের সাথে আমাদের যত সহজে ভাব হল, আমার মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি আমাদের এর আগে কারো সাথে বন্ধুত্ব হয়নি। একজন আরেকজনের কথা বুঝি না, কিন্তু তবুও আকারে ইঙ্গিতে চোখের ভাষায় তাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলাম। আমরা যাচ্ছি একটা অ্যাডভেঞ্চারে, দূর পাহাড়ে টি-রেঞ্জের সন্ধানে। আমাদের পেছনে লেগেছে এক ভয়ঙ্কর বদমাশ সাহেব। তার সাথে ঘোগ দিয়েছে কাচু মিয়া নামের একজন খুনে। আমাদের নৌকা আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। আমরা কোনমতে পালিয়ে এসেছি। তাই আমরা এখন পাহাড়ের মাঝে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পাহাড়টা পার হয়ে অন্য পাশে গিয়ে নৌকা ধরব। সেখানে মুসলিম ভাই আমাদের জন্যে নৌকায় অপেক্ষা করছেন।

খোয়াংসা চাই কতটুকু বুঝল, কে জানে, কিন্তু দেখলাম সে খুব গভীর হয়ে তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। দড়ির ফাঁসটা পেঁচিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিল, ঘোপের ভেতর থেকে বের করে আনল তীব্র ধনুক, বাঁশের তৈরি তামাক খাওয়ার একটা পাইপ, তারপর রাম দাটা হাতে নিয়ে সে বুঝিয়ে দিল সে প্রস্তুত।

আমরা কিসের জন্যে প্রস্তুত জানতে চাইলাম, সে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, সে আমাদের সাথে যাবে। যদি সেই সাহেব বা কাচু মিয়া এসে হাজির হয়, সে এক কোপে তাদের মাথাটা নামিয়ে দেবে। শনে আমাদের আনন্দ দেখে কে! বাচ্চা একটা ছেলে, বয়স নিশ্চয়ই আমাদের থেকে একদিনও বেশি হবে না, কিন্তু কী আশ্চর্য তার

আত্মবিশ্বাস ! কী তার সাহস ! যদি সে আমাদের সাথে থাকে, তাহলে আমাদের ভয় কি ?

রওনা দেয়ার আগে থোয়াংসা চাই খুব যত্ন করে তার বাঁশের পাইপে তামাক ভরে ফস করে ম্যাচ দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে নিল তারপর খুব শখ করে সেটা টানতে থাকে। এত ছোট ছেলেকে আমরা এর আগে এত শখ করে তামাক খেতে দেখিনি।

তামাকটা খুব ভাল করে জ্বলে ওঠার পর সে পাইপটা আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়, আমি সভয়ে মাথা নাড়লাম। রাজু চোখ কপালে তুলল, কিন্তু খালেদ, যে মনে করে সিগারেট খাওয়া আর মাথার গুলি করার মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, থোয়াংসা চাইয়ের চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে বাঁশের পাইপটা মুখে নিয়ে একটা টান দিয়ে বসল।

তারপর খালেদের যা একটা অবস্থা হল, সেটা সত্যি বলৱ মত না। লাফিয়ে কুদিয়ে কাশতে একটা বিত্তিকিছি অবস্থা। খালেদের চোখে পানি এসে গেল, থোয়াংসা চাই সেটা দেখে খুব হতাশ ভঙ্গিতে খালেদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে থাকে। তাকে দেখে বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না যে আমাদের দেখে তার খুব আশা ভঙ্গ হয়েছে !

খালেদ একটু সামলে নেবার পর আমরা রওনা দিলাম। সবার সামনে থোয়াংসা চাই, তার হাতে বিশাল রামদা, সামনে কোন গাছপালা, লতাপাতা আসতেই সে তার রামদা ঘূরিয়ে সেটা কেটে ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হল, সে বুঝি একটু উচ্চেষ্টাপথে যাচ্ছে। একটু পরেই সে একটা হাঁটাপথে তুলে দিল। তখন হাঁটা আমাদের জন্যে খুব সহজ হয়ে গেছে।

ছোট চাচা গজগজ করতে করতে বললেন, এই জংলী কী এখন আমাদের সাথে যাবে নাকি ?

হ্যাঁ ছোট চাচা, আমি বললাম, আর কোন ভয় নেই। আপনার কাছু সিয়া থোয়াংসা চাইকে দেখলে কাপড়ে পেশাব করে দেবে।

ছোট চাচাকে সেটা নিয়ে খুব আঙ্গাদিত হতে দেখা গেল না।

থোয়াংসা চাই খুব তাড়াতাড়ি আমাদের নিয়ে কিভাবে কিভাবে জানি পাহাড়ের পাশে ছোট খালটার কাছে নিয়ে এল। সেখানে সত্যি সত্যি মুসলিম ভাই নৌকা নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মনে হয় রান্না হয়ে গেছে। কারণ কাছে আসতেই খাবারের প্রাণে আমাদের জিবে পানি এসে গেল।

মুসলিম ভাই আমাদের দেখে অবাক হয়ে বলল, অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন দেখি !

রাজু বলল, হ্যাঁ। এই যে থোয়াংসা চাই ! আমাদের নিয়ে শট কাট মেরে চলে এসেছে।

ভালই হল। আপনাদের এরকম জায়গায় ধূরে ফিরে অভ্যাস নেই, তাই একটু চিন্তায় ছিলাম।

ছেট চাচা শুকলো গলায় জিঞ্জেস করলেন, কাচু মিয়ার কি খবর?

মুসলিম ভাই বলল, একটু আগে নৌকা করে গেল। সাথে সেই সাহেব। সব মিলিয়ে মেট চারটা নৌকা। নৌকোর যাকে মালপত্র আর লোকজন দেখে মনে হয় যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

ছেট চাচা চিন্তিত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ, অ্যাডভেঞ্চার অনেক হয়েছে। জীবনে মনে হয় এত অ্যাডভেঞ্চার হয়নি। লিখলে বই হয়ে যাবে। চল এখন ফিরে যাই।

খালেদের সাথে থেকে থেকে আন্তে আন্তে আমাদেরও সাহস বেড়ে গেছে। আমি বললাম, ছেট চাচা, তুমি ফিরে যাও। আমরা জায়গাটা গিয়ে দেখে আসি।

রাজু মনে হল আরো এক ডিগ্রি ওপরে। গভীর গলায় বলল, শুধু জায়গাটা দেখে আসব না, সাহেবের বারটা বাজিয়ে দেব।

ছেট চাচা রাগ চেপে রেখে বললেন, সেটা কেমন করে হবে শুনি?

খালেদ বলল, প্ল্যান করছি। তুমি শুধু দেখ।

ঠিক কি নিয়ে কথা হচ্ছে থোয়াংসা চাইয়ের বোঝার কোন উপায় নেই কিন্তু দেখলাম সে গভীর হয়ে মাথা নেড়ে রামদাটা মাথার ওপরে তুলে একটা হঙ্কার দিল।

ছেট চাচা তখন হাল ছেড়ে দিলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, কাগজ আছে কারো কাছে।

আছে, কেন?

একটা চিঠি লিখি।

কাকে?

বান্দরবন থানার ও.সি.কে। জানিয়ে রাখি ব্যাপারটা। মাঝি, চিঠিটা পৌছানো যাবে না?

কোন অসুবিধা নেই। ফিরে যাচ্ছে সে রকম কোন মাঝিকে দিয়ে দেব। পৌছে দেবে।

ছেট চাচা সময় নিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। ছেট চাচা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়েন কিন্তু লেখার হাত খুব ভাল। এমন একটা চিঠি লিখলেন যে, সে চিঠি পড়ে বান্দরবন থানার ও. সি. যদি সাথে শাখানেক পুলিশ নিয়ে ছুটে না আসে, আমি কান কেটে ফেলব।

## ৮. আক্রমণ

আমাদের নৌকা আবার চলছে। সাহেব আর কাচু মিয়া তাদের নৌকা নিয়ে ঘন্টা চারেক আগে গিয়েছে, আমরা তাদের পেছনে। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে বেশ নিরাপদ। আমরা নদীতীরের লোকজন, উল্টোদিক থেকে আসা মাঝিদের জিজ্ঞেস করে তাদের সম্পর্কে খোজখবর নিতে পারি, কিন্তু তারা কখনোই আমাদের খোজ নিতে পারবে না। ছোট চাচা ভেতরে লম্বা হয়ে ওয়ে আছেন। আমরা চারজন বাইরে। খোয়াংসা চাহিয়ের দেখাদেখি আমাদেরও এখন খালি গা, তবে আমাদের শরীর হাড় জিরজিরে, মোটেও তার মত এত সুন্দর নয়। কিন্তু পাহাড়ের মাঝে এই নির্জন নদীতে সেটা নিয়ে আমাদের তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই।

খোয়াংসা চাহিয়ের সাথে কথা বলার জন্যে একটি দুটি আঞ্চলিক শব্দ শিখে নিয়েছি। মুসলিম ভাইও বেশ কিছু শব্দ জানে। সেগুলো ব্যবহার করে অনেক রকম কথা বলা হয়ে গেছে। খোয়াংসা চাহিয়েরা ছ' ভাইবোন। সে সবচেয়ে ছোট। এক দুইদিন বাসায না গেলে তার বাবা মা কখনো চিন্তা করে না। তার স্কুলে যাবার কোন ইচ্ছে নেই। টেলিভিশন কি সে জানে না। গাড়ি বলে একটা জিনিসের কথা সে শুনেছে, তবে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে আকাশে প্লেন উড়তে দেখেছে, তার ধারণা, ব্যাপারটায় কোন ধরনের যাদু আছে। তার কী ধর্ম সে জানে না। বড় হয়ে তার ঘর সংসার করার ইচ্ছে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হবে। তাদের নিয়ে সন্ক্ষয়েলো ঘরের দাওয়ায় বসে গান গাইবে।

জীবনকে নিয়ে কি করবে, সেটা এত নিখুঁতভাবে ঠিক করে রাখতে আমি আগে কাউকে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, শুনে আমাদের কেমন জানি একটু হিংসে হতে লাগল !

সারাদিন ধরে নৌকা চলল। আস্তে আস্তে জংগল আরো গভীর হয়ে উঠেছে, আরো জনমানবহীন হয়ে উঠেছে। দুপাশে খাড়া পাহাড়, নদীর পানি কোথাও কোথাও গভীর, কালো পানি সেখানে ঘৃণ্ণবস্ত তৈরি করে ঘূরছে। পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে বুনো পশুর ডাক শুনতে পাই, খোয়াংসা চাই সে ডাক শুনে আপন মনে মাথা নাড়ে। আমরা বসে বসে একটা পরিকল্পনা করার চেষ্টা করি, কিন্তু চারজন ছোট ছেলে তার মাঝে একজন আমাদের কথা বুঝে না, আর একজন ভীরু বড় মানুষ নিয়ে একটা বিদেশী সাহেব, কাচু মিয়ার মত খুনে আর চার নৌকা বোঝাই মানুষের সাথে কেমন করে লড়া যায়, চিন্তা করে পেলাম না। আমরা বসে বসে অনেক চিন্তা করে দুটি সিদ্ধান্তে পৌছালাম। সেগুলো হচ্ছে :

(এক) ফ্রেডারিক সাহেবের কাছে নানা রকম বাস্তু প্যাটারা আছে, তার মাঝে নিচয়ই নানারকম যন্ত্রপাতি, সেগুলি ব্যবহার করে সে নিশ্চয় ফনিলগুলি তেলার চেষ্টা করবে। যেভাবেই হোক তার বাস্তু প্যাটারাগুলি আটকাতে হবে। চেষ্টা করতে হবে

নদীতে নৌকাগুলি ডুরিয়ে দিতে, বাত্রে যখন বিশ্রাম নেবে তখন চূপিচুপি গিয়ে নৌকার তলায় ফুটো করে দিতে পারলে হয়। সেটা অবশ্যি কেমন করে করা হবে, আমাদের জানা নেই।

(দুই) ফ্রেডারিক সাহেবের সাথে মানুষ অনেক বেশি কাজেই কোন রকম বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের ভাগিয়ে দিতে হবে। সাহেব এবং কাচু মিয়া জানে না যে আমরা তাদের পিছু পিছু এসেছি, আমরা তাদের কোন রকম ভয় দেখাতে পারি। জায়গাটাতে পাহাড়ি দানো থাকে বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, মনে হয় সেটা ব্যবহার করা যাবে। কেমন করে ভয় দেখানো হবে, সেটা এখনো আমাদের জানা নেই।

আমরা সারা দিন বসে বসে চিন্তা ভাবনা করলাম, খুব একটা লাভ হল না। ছেট চাচাকেও আমাদের আলাপ আলোচনায় টেনে আনতে চাইছিলাম কিন্তু আনা গেল না, নৌকার ঘাঁষে গোমড়া মুখে শুইয়ে রাখলেন।

আমরা ঝুমিয়া পৌছালাম সঙ্ক্ষেবেলা সূর্য ডুবে যাবার পর। ফ্রেডারিক সাহেবের দলবল তাদের নৌকা থামিয়েছে ঠিক ঝরনার মুখে। আমরা আমাদের নৌকা থামালাম তার বেশ আগে, একটা ঝাপড়া গাছের আড়ালে। মুসলিম ভাই নৌকা থামিয়ে চূপিচুপি দেখে এসে খবর দিল, সাহেব আর তার লোকজন নৌকা থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখছে। রান্নার আয়োজন করছে, সাহেব একটা গাছের গোড়ায় বসে পেট মেটা একটা বোতল থেকে মদ খাচ্ছে। কাচু মিয়া সাহেবের আশ পাশে ঘোরাঘুরি করছে মদের ভাগ পাবার আশায় কিন্তু সাহেব তাকে কিছু দিচ্ছে না। ভাব দেখে মনে হয়, তারা রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে রওনা দেবে।

মুসলিম ভাই যখন আমাদের জন্যে রান্না চাপাল তখন ছেট চাচা আমাদের আক্রমণের প্রথম পরিকল্পনাটা বললেন। আমরা ভেবেছিলাম, ছেট চাচা গোমড়া মুখে বসেছিলেন কিন্তু আসলে সারাক্ষণ চিন্তা করছিলেন কি করা যায়। ছেট চাচা যখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন তখন তাকে কেমন জানি গোমড়ামুখী দেখায়! ছেট চাচার পরিকল্পনাটা খুব ভাল, শুনে আমরা আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম! শুধু যে পরিকল্পনাটা ভাল তাই নয় তার পরিকল্পনাটা শুনে আমরা জানতে পারলাম, ছেট চাচা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, আমাদের মনের জোর তখন বেড়ে গেল একশ গুণ।

ভাল পরিকল্পনা সহজ হতে হয়। ছেট চাচার পরিকল্পনাটা ভাল কারণ সেটা খুবই সহজ! ফ্রেডারিক সাহেবকে থামিয়ে দেয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তার জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়া। সেটা আগুন ধরিয়ে নষ্ট করে দেয়া হবে। আগুন ধরানো হবে খোয়াংসা চাহিয়ের তীর ধনুক দিয়ে। তীরের মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে তারপর সেই জ্বলন্ত তীর ছুঁড়বে খোয়াংসা চাই! সেই তীর পড়বে সাহেবের জিনিসপত্রে। দাউ দাউ করে সবকিছু জ্বলে উঠবে!

পুরো ব্যাপারটা করা হবে জসলে লুকিয়ে, কেউ জানতেও পারবে না কেমন করে হল !

উজ্জেন্নায় আমাদের তখন খিদে তৎও চলে গেছে। মুসলিম ভাই খুব ঘজার খিচুড়ি রান্না করেছেন, সাথে ডিম ভাজা, তাড়াতাড়ি করে আমরা সেটা খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি রাত আরেকটু গভীর হওয়ার জন্য। ছোট চাচা তার গেঞ্জি ছিড়ে তীরের মাথায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেশ করেকটা আগুন জ্বালানোর তীর তৈরি করলেন। খোয়াংসা চাই সেগুলি ছুড়ে ছুড়ে দেখল, গভীর হয়ে পিছনে আরো কিছু পালক বেঁধে নিল। তাকে বোঝানো হয়েছে কি করতে হবে, শুনে তার মুখে এগাল গোল জোড়া হাসি।

রাত গভীর হওয়ার পর আমরা মুসলিম ভাইয়ের হ্যারিকেনটা নিয়ে রওনা দিলাম। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, নেয়া হয়েছে কেরোসিনের জন্য। আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে কিন্তু সেটা জ্বালানো হচ্ছে না, ফ্রেডারিক সাহেবের লোকজন দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘুটঘুটে অঙ্ককার, আমরা বলতে গেলে কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু খোয়াংসা চাইয়ের একেবারে বিড়ালের মত চোখ, এই অঙ্ককারেও স্পষ্ট দেখতে পায়। তার পিছু পিছু আমরা সাহেবের আস্তানার কাছাকাছি এলাম। একপাশে একটা তাঁবু, ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেই আলোতে তাঁবুটাকে কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে, বলার মত নয় ! এটা নিশ্চয়ই ফ্রেডারিক সাহেবের তাঁবু, এখনও নিশ্চয় ঘুমায় নি, তাহলে হয়ত আলো নিভিয়ে দিত। তাঁবুর সামনে বেশ খানিকটা দূরে একটা আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের সামনে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন মানুষ। আমরা আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম, মানুষটার হাতে একটা বন্দুক।

তাঁবুর পাশে নানা রকম বাজ্জ, সেগুলির মাঝে নিশ্চয় রয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতি। আমাদের সেগুলি আগুন ধরিয়ে নষ্ট করতে হবে।

ছোট চাচা বন্দুক হাতে মানুষটাকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেলেন। আমাদের কাঁধ খামচে ধরে ফিসফিস করে বললেন, ভেবে দ্যাখ সত্যিই চেষ্টা করবি কি না। গুলি করে মেরে টেরে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এতদূর এসে আমরা তো পিছিয়ে যেতে পারি না। আমরা মাথা নেড়ে বললাম, ভয় পাবেন না ছোট চাচা, ঠিক জ্বালিয়ে দেব সবকিছু।

বন্দুক হাতে মানুষটাকে দেখে পরিকল্পনা একটু ঝদবদল করা হল। ঠিক করা হল, খোয়াংসা চাই তার আগুনের তীর ছুড়বে মানুষটার পেছন থেকে যেন সে দেখতে না পায়। খোয়াংসা চাইয়ের সাথে থাকবে শুধু একজন, অন্যেরা আগেই সরে যাবে। পালিয়ে যাবার রাস্তায় টর্চ লাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে দেখানোর জন্য। সবাই খোয়াংসা চাইয়ের সাথে থাকতে চায়। গলা নামিয়ে খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি করে শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতে দেয়া হল।

আমি আর খোয়াংসা চাই দাঁড়িয়ে রহিলাম তখন অন্যের ধীরে ধীরে সরে গেল। আমরা তখন আরেকটু এগিয়ে গেলাম। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি খোয়াংসা

চাইয়ের একটা তীর নিয়ে কেরোসিন তেলে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে ফস করে দেয়াশলাহ্টা দিয়ে জ্বালিয়ে দিলাম। সাথে সাথে তীরটা মশালের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

আমরা বন্দুক হাতে মানুষটার পেছন দিকে ছিলাম, কিন্তু আগন্তনের শিখায় চাবদিক আলোকিত হয়ে উঠতেই লোকটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমি সাথে সাথে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

থোয়াংসা চাই তীরটা ধনুকে লাগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয়, সে বুঝি কি করবে ভুলে গেছে। কিন্তু আমি জানি, সে অপেক্ষা করছে আগন্টা ভাল করে ধরার জন্যে না হয় তীরটা ছুটে যাবার সময় নিভে যাবে। বন্দুক হাতে মানুষটা অবাক হয়ে থোয়াংসা চাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিশ্চয়ই একেবারে হতবাক হয়ে গেছে। ঘন অরণ্যে নিশি রাতে একটা পাহাড়ি ছেলে হাতে তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তীরের মাথায় দাউদাউ করে জ্বলছে আগন, দশ্যটা নিশ্চয়ই প্রায় অশরীরি! লোকটা বন্দুক হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে থোয়াংসা চাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি চাপা গলায় বললাম, মার থোয়াংসা চাই! মার!

থোয়াংসা চাই খুব ধীরে ধীরে ধনুকটা প্রায় আকাশের দিকে মুখ করে ধরে, খুব ধীরে ধীরে তীরটা টেনে আনে তারপর ছেড়ে দেয়। জ্বলন্ত আগন্তনের ফুলবির মত তীরটা ওপরে উঠে যায় তারপর নিচে নামতে থাকে, সাহেবের তাবুর ওপর দিয়ে গিয়ে এটা নিচে এসে পড়ে, ঠিক যেখানে বাঞ্ছবোঝাই জিনিসগুলি রেখেছে সেখানে। তীরটা নিভে গেল না, বরং আগন্টা ছড়িয়ে পড়ল বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

বন্দুক হাতে লোকটার মনে হল কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। যখন বুঝতে পারল, তখন বিকট চিৎকার করতে করতে আগন নেভানোর জন্যে ছুটে যায়। তার চিৎকার শব্দে সাহেব তাঁর তাঁবু খুলে বের হল, ছোট একটা লাল জাঙিয়া ছাড়া পরনে আর কিছু নেই। আগন্টা দেখে সে হঠাতে বিচ্ছি একটা কাজ করল, সেটা নেভানোর কোন চেষ্টা না করে উল্টেদিকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে নদীর ঘাঁষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন কিছু বেশি আগন নয়, একটু চেষ্টা করলেই নিভিয়ে ফেলতে পারত কিন্তু কেন সেটা নেভানোর চেষ্টা করল না বুঝতে পারলাম না। বন্দুক হাতে মানুষটা দুই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দেখলাম, সেও ছুটে গেল সাহেবের পেছনে পেছনে। আমি আর থোয়াংসা চাই দেখলাম, আশে পাশে কেউ নেই। আগন্টা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, অন্য তীরগুলি ব্যবহার করার কোন দরকার নেই।

থোয়াংসা চাই তখন উঠে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে গেল। আশে পাশে কাউকে না দেখে সে আরেকটু এগিয়ে গেল, তারপর আরেকটু— আর হঠাতে আমি বুঝতে পারলাম সাহেব কেন আগন্টা নেভানোর কোন চেষ্টা না করে পালিয়ে গেছে। ঐগুলি ডিনামাইটের বাঞ্ছ! আমরা ডিনামাইটের বাঞ্ছে আগন লাগিয়ে দিয়েছি, এক্ষুণি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ করে পুরোটা ফাটিবে। সর্বনাশ! সর্বনাশ!!

আমি বিস্ফোরিত চোখে দেখলাম, খোয়াংসা চাই ওদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ! কি করছি বুঝতে না পেরেই আমি তার দিকে ছুটে গেলাম, তাকে জাপটে ধরে আমি টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম, তার গায়ে মোবের মত জোর, এতটুকু সরাতে পারলাম না। আমি বেপরোয়ার মত আবার তাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে হিচড়ে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে কয়েক পা পিছিয়েছি ঠিক তক্ষুণি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মনে হল পুরো পৃথিবী দুলে উঠল !

আমরা নিশ্চয়ই ঠিক সেই সময় মাটিতে ঝাপিয়ে পড়েছি কাবণ আগুনের একটা হলকা আমাদের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। আমি আর খোয়াংসা চাই ওড়ি মেরে সরে যেতে থাকি, দাউদাউ করে চারদিকে আগুন জ্বলছে, আগুনের গরম হলকা লুগছে আমাদের চোখমুখে ।

বিস্ফোরণটা ঘটে যাবার সাথে সাথে সাহেব আর লোকজন ছুটে আসতে থাকে, ঘটিবাটি যা আছে সেটাতে করে পানি আনতে থাকে আগুন নেভানোর জন্য। কিন্তু তখন সেটা বিশাল এক আগুন, নেভানো খুব সহজ ব্যাপার নয় ।

আমরা জঙ্গলে গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে দেখলাম সাহেব বন্দুক হাতের মানুষটার শাটের কলার ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছে, কেমন করে হল ? কেমন করে হল ?

লোকটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল স্থানীয় মানুষ। ট্রাইবাল পিপল। বাচ্চা ছেলে। বাচ্চা ছেলে ।

সাহেব গর্জন করে জিজ্ঞেস করল, কয়জন ছিল ?

একজন। জাস্ট ওয়ান ।

কেন করল ?

পাহাড়ি দানো। চায় না আমরা যাই। ভেরি ডেঙ্গারাস ।

সাহেব ইংরেজিতে বলল, আমি পাহাড়ি দানোর মুখে পেছাব করে দিই ।

ভয়কর বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ছেট চাচা, খালেদ আর রাজু ভেবেছিল, আমি আর খোয়াংসা চাই বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছি। যখন দেখল আমরা ভালয় ভালয় ফিরে এসেছি, তাদের কী যে আনন্দ হল বলার মত নয়। ছেট চাচা এক হাতে আমাকে, আর এক হাতে খোয়াংসা চাইকে বুকের মাঝে চেপে ধরে অনেকক্ষণ একটা গাছের নিচে বসে রইলেন। আমি ছেট চাচাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ছেট চাচা, আমরা ভাল আছি, কিছু হয় নি। সত্যি কিছু হয় নি ।

ছেট চাচা কিছু না বলে আরো জোরে আমাদের বুকে চেপে ধরে রাখলেন। টর্চলাইটটা জ্বালানো নিষেধ কিন্তু আমি লিখে দিতে পারি, যদি সেটা জ্বালাতাম তাহলে দেখতাম ছেট চাচার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। ছেট চাচা অনেক রাগারাগি করেন, কিন্তু তার মন্টা একেবারে বাচ্চাদের মত নরম !

## ৯. রাতের ঘাত্রা

নৌকায় ফিরে এসে আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে বনে রহিলাম। হঠাতে করে আমরা টের পেতে শুরু করেছি ব্যাপারটা ছেলেমানুষি ব্যাপার নয়। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে এখন, আমাদের কেউ মারা যেতে পারে, খুন হয়ে যেতে পারে কেউ।

ছোট চাচা বললেন, খুব সাবধানে এগুতে হবে।

খালেদ বলল, যখন কোথাও ফসিল পাওয়া যায় খুব সাবধানে সেটা আস্তে আস্তে তুলতে হয়। আর এই ব্যাটা বদমাইস ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে উড়িয়ে ফসিল বের করতে এসেছে।

রাজু বলল, আমাদের দেশের একটা সম্পদ, তার জন্যে কেন মায়া দয়া নাই।

ছোট চাচা বললেন, আগুনে অনেক ক্ষতি হয়েছে ওদের কিন্তু আমার মনে হয় তবুও রা চেষ্টা করবে।

আমরা যাথা নাড়লাম।

সাহেবের লোকজন এখনো জানে না আমাদের কথা, ভেবেছে থোয়াংসা চাই একা নিজে নিজে করেছে! খুব ভাল হয়েছে এটা। আমরা লুকিয়ে আরো কিছু করতে পারব।

কি করবে?

ব্যাটা বদমাইসদের আটকে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুলিশ আসছে।

কেমন করে আটকে রাখবেন?

ছোট চাচা যাথা চুলকালেন তারপর বললেন, কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে হবে।

ভয় দেখালে কেমন হয়?

কেমন করে দেখাবি? একজন দুঃজন মানুষকে ভয় দেখালো যাব। এতজন মানুষ যদি একসাথে থাকে, হাতে বন্দুক, ভয় দেখাতে গিয়ে খুন হয়ে যাব।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ছোট চাচা বললেন, ব্যাটা বদমাইসগুলি কাল ভোরের আগে রওনা দিতে পারবে না, আমাদের তার আগেই সেখানে পৌছাতে হবে।

খুব ভোরে উঠে রওনা দিয়ে দেব।

উহ, ছোট চাচা যাথা নাড়লেন। ভোরের জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না। আমাদের এখুনি রওনা দিতে হবে।

এখুনি? আমরা প্রথমে ভাবলাম ছোট চাচা ঠাট্টা করছেন কিন্তু দেখলাম ঠাট্টা নয় সত্যি সত্যি এখুনি রওনা দিতে চান। আমি বললাম, এই মাঝ রাতে?

হ্যাঁ, ছোট চাচা যাথা নাড়লেন, অ্যাডভেঞ্চারে যখন যাবি, ঠিক করেই যাওয়া যাক। এই যুদ্ধে আর এপার ওপার নেই। আজ রাতেই আমরা ফসিলের কাছে পৌছে যাব, কাল সারা দিন থাকবে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্যে। তার মাঝে নিশ্চয়ই পুলিশ এসে যাবে।

আমাদের একটু ঘূম ঘূম পাছিল কিন্তু এখনি রওনা দেব শুনে ঘূম চটে গেল। সবাই নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ভোরে খাবার জন্য মুসলিম ভাই বেশ কয়টা রুটি তৈরি করেছিলেন, সেগুলো নিয়ে নিলাম। এমনিতে খাওয়ার জন্যে চিড়া আর গুড়। চিড়ার ওপরে নাকি খাবার নেই, যতদিন খুশি রাখা যায়, যেভাবে খুশি খাওয়া যায়! মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন পাকিস্তানী মিলিটারির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দীর্ঘ পথ পার হওয়ার সময় সাথে নিত চিড়া। আমাদের নিজেদের তখন হঠাৎ মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী মনে হতে থাকে।

আমরা রওনা দেওয়ার সময় মুসলিম ভাই বলল, আমি এখানে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করব। তারা যদি সময়মত না আসে তাহলে আরো কিছু যাবি নিয়ে আমি যাব আপনাদের খোজে।

ছেট চাচা বললেন, ঠিক আছে।

আমরা গভীর রাতে অঙ্ককার পথে মোটামুটিভাবে একটা অজানা গন্তব্য পথে রওনা দিলাম। কেউ বলে দেয় নি কিন্তু আমরা সবাই জানি সেখানে নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করছে বিচ্ছিন্ন বিস্ময়।

বেশ খানিকটা ঘূরে সাহেবদের তাঁবু এবং লোকজনকে পাশ কাটিয়ে আমরা ছেট স্রোতধারার পাশে হাজির হলাম। এখন এটার তীর ধরে হেঁটে যেতে হবে দীর্ঘ পথ। আমরা টর্চ জ্বালিয়ে যাচ্ছিলাম, খোয়াংসা চাহিয়ের সেটা খুব পছন্দ হল না। জংগল থেকে কিছু শুকনো ডাল এনে আগুন জ্বালিয়ে মশাল তৈরি করে নিল, মনে হয় বুনো পশু আগুন দেখলে ধারে কাছে আসবে না। খোয়াংসা চাহিয়ের হাতে একটা মশাল, সে সবার আগে আগে যাচ্ছে, আমরা পেছনে পেছনে। গভীর রাত, ঘৃটঘৃটে অঙ্ককার, কোথাও কোন জনমানব নেই। গভীর অরণ্যের মাঝে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমাদের বুকে কেমন জানি শিহরণ হতে থাকে।

রাজু নিচু গলায় বলে, ছেট চাচা।

কি হল।

একটা গল্প বলেন, শুনি।

গল্প?

হ্যাঁ।

কিসের গল্প?

আমি বললাম, ভূতের।

ছেট চাচা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ভয় পাবি না তো?

না, পাব না।

শোন তাহলে, ছেট চাচা শুরু করলেন, আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম শওকত। তাদের বাসা মুহূর্মুরে। আমাদের সাথে পড়ে। সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার আগে আমাদের পড়ার খুব চাপ। একদিন তার বাসায় গেছি, অঙ্ক করতে করতে রাত

হয়ে গেল। কঠিন সব অঙ্ক। একটা শেষ করতে ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। চার চারটা পারশিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান শেষ করে দেখি রাত বারটা বেজে গেছে।

শওকত বলল, এত রাত হয়েছে বাসায যেয়ে কি করবি? থেকে যা এখানে।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

শওকত বলল, বাসায চিন্তা করবে না তো?

আমি বললাম, আমার বাসায কারো আমার জন্য কোন মাথাব্যথা নেই। দু'তিন দিন না গেলেও কেউ খোজ করবে না।

আমি ছেট চাচার গল্পে বাধা দিয়ে বললাম, না ছেট চাচা, সেটা মোটেও ঠিক নয়। আমি প্রত্যেকদিন তোমার খোজ করি।

ছেট চাচা বললেন, তোরা হয়তো করিস কিন্তু আর কেউ করে না। যাই হোক, শওকত বলল, চল ঘূমুবি।

শওকতদের তিনতলা বাসা। ছাদে একটা ছেট ঘর তৈরি করা হয়েছে, সেখানে শওকত থাকে। তার ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিচে চলে গেল।

আমার ঘূম খুব বেশি। যে কোন জায়গায় আমি যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু কেন জানি শওকতের ঘরে শুয়ে আমার ঘূম আসতে চাইল না। আমি শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম আর কেমন জানি আমার এক ধরনের অস্বস্তি হতে লাগল। অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে যখন এপাশ ওপাশ করছি তখন হঠাৎ শুনি ছাদে কে যেন ইঁটছে। অনেক রাত হয়েছে, এত রাতে কারো ছাদে ইঁটাহাটি করার কথা না, আমি বেশ অবাক হলাম। যাই হোক, ব্যাপারটাতে গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছি তখন মনে হল একজন নয়, বেশ কয়েকজন ইঁটছে। এত রাতে শওকতদের বাসার সবাই ছাদে চলে এসেছে? আমি বেশ অবাক হলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেছে, তখন শুলাম ছাদে লোকজন শুধু ইঁটছে না, নিচু গলায় কথা বলছে। বেশির ভাগ মনে হল মেয়েদের গলা, আর কথাগুলিও যেন কেমন, মনে হয় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, মনে হল যেন একটু একটু কাঁদছে।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। বিছানা থেকে উঠে আমি দরজা খুললাম, আর—

ছেট চাচা থেমে গেলেন আর আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম, আর?

ছেট চাচা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, দেখলাম আমার ঘরের সামনে অনেক মানুষ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম, দেখি কিছু পুরুষ, কিছু মহিলা, তাদের শরীরে রক্ত, মুখে রক্ত, হাত পা ছিন ভিন্ন, ভেতর থেকে হাড় বের হয়ে আছে। আমি মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে কোন মতে বললাম, কে?

সাথে সাথে মানুষগুলি নড়তে শুরু করে, দেখি একজন আরেকজনের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে, চিংকার করতে শুরু করেছে, ছুটতে শুরু করেছে। তারপর কিছু বোঝার আগে দেখি ছাদে একটি মানুষও নাই। ধূ ধূ ফাঁকা। শুধু একটা কাক কা কা করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যেতে থাকে।

আমি তখন নিশ্চয়ই বিকট চিৎকার করে উঠেছিলাম কারণ দেখলাম সাথে সাথে  
শওকত আর তার বাসার লোকজন ছুটে এসেছে ওপরে। আমি কিছু বলার আগেই সে  
আমাকে ধরে বলল, নিচে আয়, তুই নিচে আয়—

আমি বললাম, শওকত, আমি দেখলাম—

শওকত বলল, আমি জানি। আমি জানি। আসলে আমারই ভুল হয়েছে। তুই  
নতুন মানুষ, তোকে একা ঘূমাতে দেয়া ঠিক হয় নাই।

আমি থর থর করে কাঁপছিলাম, শওকত বলল, একান্তর সালে মুহুর্মুহুরের এই  
এলাকায় বাঙালিদের মেরে কেটে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। ছাবিশে মার্চ মাসে এই  
বাসাতে ছাবিশটা ভেড়বড়ি পড়েছিল। সেই থেকে এই বাসায় এরকম, আমাদের  
কখনো কিছু হয় না, কিছু দেখি না। নতুন কেউ এলে তার পায়—

আমরা অনেকক্ষণ কোন কথা বললাম না। খালেদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে  
বলল, তুমি বানিয়ে খুব সুন্দর গল্প বলতে পার। একেবারে সত্য গল্পের মতন।

ছোট চাচা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি বানিয়ে বলি নাই খালেদ।

বলেছিলাম তার পাব না, কিন্তু গল্প শুনে ভয়ে হাত পা আমাদের শরীরের ভিতরে  
চুকে যেতে চাইছে। আমরা কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে থাকি। ঘুটঘুটে অঙ্কুর  
রাত, একটা ছোট স্নোতধারার পাশে দিয়ে হাঁটছি। দুপাশে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়।  
রাত জাগা পাখির ডাক শুনছি। যাকে মধ্যে পাতার ওপর দিয়ে শরশর করে কিছু একটা  
চলে যাচ্ছে, কে জানে সাপ নাকি অন্য কিছু। সবার সামনে দিয়ে খোয়াংসা চাই হাঁটছে,  
তার হাতে একটা মশাল। মশালের আলোতে সবকিছু কী আশ্চর্য, কী অবাস্তব মনে  
হচ্ছে!

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে গেলাম। মনে হয়, এই হাঁটার বুর্বুরি আর কোন শেষ  
নেই। প্রথম প্রথম পা ব্যথা করছিল, কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর সেই ব্যথাও ক্ষেমন জনিন  
কমে গেল। আমাদের ঘাড়ের বোঝাগুলি আন্তে আন্তে ভারী হতে শুরু করল কিন্তু  
আমরা জানি আমাদের থামার কোন সময় নেই, তাই সেই ভারী বোলা ঘাড়ে নিয়েই  
আমরা হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে যখন মনে হল আর পারি না তখন রাজু বলল, ছোট চাচা, আর তো  
পারি না।

খালেদ বলল, হ্যাঁ ছোট চাচা, এখন একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।

ছোট চাচা বললেন, ঠিক ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। বেশি বিশ্রাম নিলে আর নড়তে  
পারবি না।

আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি। মনে হয় এক অন্তহীন পথ—  
যার শুরু নেই, শেষ নেই। অঙ্কুরারের মাঝে এক অজানা জায়গায় যেন আমরা অদৃশ্য  
হয়ে যাচ্ছি।

মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে আর বাকী সময় হেঁটে হেঁটে হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করি, আকাশে কেশন জানি আলো দেখা যাচ্ছে ! আমরা কি হেঁটে হেঁটে একটা রাত পার করে দিয়েছি ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছোট চাচা, কয়টা বাজে ?

পাঁচটা ।

রাজু বলল, ছোট চাচা আমি আর পারব না । আর এক পা হাঁটলেই আমি মরে যাব ।

ছোট চাচা বললেন, আর একটু । যখন হৃদের কাছে পৌছাব—

খালেদ বলল, অসম্ভব ।

আমি বললাম, অসম্ভব !

থোয়াংসা চাই কি বলল বুঝতে পারলাম না কিন্তু হাত পা নেড়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে যে জিনিসটা বলল সেটা যাই হৈক আরো কয়েকঘণ্টা হেঁটে যাওয়ার সমর্থন হতে পারে না ।

ছোট চাচা বললেন, ঠিক আছে, এখন কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়া যাক । ভোরে আবার শুরু করব ।

আমরা সাথে সাথে সেখানেই লম্বা হয়ে শুইয়ে পড়ছিলাম, থোয়াংসা চাই আপনি করল । মাটিতে ঘুরে ঘুরে কিছু একটা দেখে আমাদের বোঝাল, বনের পশ্চ এখানে পানি খেতে আসে ।

ছোট চাচা বললেন, সর্বনাশ ! পানি খেতে এসে আমাদের খেয়ে নেবে না তো !

আমি বললাম, জল এবং খাবার, জলখাবার !

থোয়াংসা চাই আমাদের রসিকতা বোঝার কোন চেষ্টাই করল না, আমাদের নিয়ে সে উপরে উঠে যেতে লাগল । বেশ খানিকটা ওপরে একটা পাথুরে সমতল জায়গা তার বেশ পছন্দ হল বলে মনে হল । সেখানে কিছু শুকনো ডালপালা জড়ে করে বড় একটা আগুন তৈরি করে সে সাথে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ।

আমরা আগুনটা ধিরে বসলাম । খোলা খুলে একটা চাদর বের করে মাটিতে বিছিয়ে মাথার নিচে খোলাটা দিয়ে আমি শুয়ে পড়ে বললাম, হাতি দিয়ে টেনেও এখন কেউ আমার চোখ খোলা রাখতে পারবে না ।

ছোট চাচা বললেন, সবাই একসাথে ঘুমালে চলবে না । একজন একজন করে পাহারা দিতে হবে ।

রাজু বলল, রূপকথার সেই প্রথম প্রহর কোটালপুত্র, দ্বিতীয় প্রহর মন্ত্রিপুত্র, তৃতীয় প্রহর রাজপুত্র ?

হ্যাঁ । কে পাহারা দেবে প্রথম প্রহর ? কে হবে কোটালপুত্র ?

আমরা কেউ রাজি হলাম না । ছোট চাচা বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমিই হব কোটালপুত্র । ঠিক এক ঘণ্টা পর টোপনকে তুলে দেব । টোপন এক ঘণ্টা পর তুলবে

খালেদকে। খালেদ তুলবে রাজুকে। রাজু তুলবে খোয়াংসা চাহিকে।

আমরা বললাম, ঠিক আছে।

খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল মাটিতে শোওয়া মাত্রই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু সাথে সাথে ঘূম এল না, বেশ খানিকক্ষণ জেগে রহিলাম। শুনতে পেলাম একজন একজন করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের একটা আলাদা রকম শব্দ রয়েছে। খোয়াংসা চাহি তার ঘুমের মাঝেই কিছু একটা বলে হেসে ফেলল, ছেলেটা কি হাসতেই না পারে! আমি গৃদু স্বরে ডাকলাম, ছেট চাচা—

ছেট চাচা কেন উত্তর দিলেন না।

আমি আবার ডাকলাম, ছেট চাচা।

এবাবে ছেট চাচার নাক ডাকা শুনতে পেলাম। ছেট চাচা যখন ঘুমান, তখন হালকা বাঁশির মত নাক ডাকে!

আমাদের প্রথম প্রত্যন্ত পাহারা দেয়ার ফোটালপুত্র ঘুমিয়ে গেছে, ঠিক রূপকথায় যেরকম হয়। তাকে ডেকে দেব ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে গেলাম।

## ১০. ফসিল

আমাদের ঘূম ভাঙল খালেদের চিৎকারে। প্রাণপনে চেঁচাচ্ছে সে, গলা ফাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম, বেশ খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে আমি বেস্থায়। হঠাতে করে সব মনে পড়ে গেল, তখন লাফিয়ে দাঁড়ালাম আমি, খালেদের কাছে ছুটে গেলাম, সে হাত দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। আমার পিছু পিছু অন্য সবাই ছুটে এসেছে। আমরা পাহাড়ের এক কিলারাও দাঁড়িয়ে সামনে তাকালাম, আর হঠাতে মনে হল হৃষ্মপন্দন বুঝি থেমে গেল!

সে কী অপরাপ, সে কী বিস্ময়কর দৃশ্য! চারপাশে খাড়া পাহাড়ের সারি আর তার ঠিক মাঝখালে ছবির মত একটা হুদ। নীল টলটলে পানি, মনে হচ্ছে কেউ যেন আকাশের এক টুকরা ভেঙ্গে এখালে গেঁথে দিয়েছে। খাড়া পাথরের দেয়াল আর সেই পাথর থেকে একটা প্রাণীর মাথা বের হয়ে আসছে। একটা প্রাণীর কঙ্কাল, বিশাল মুখ ইঁ করে আছে, ভয়ঙ্কর দাঁত, দেখে মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল না, পাথরে আটকা পড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

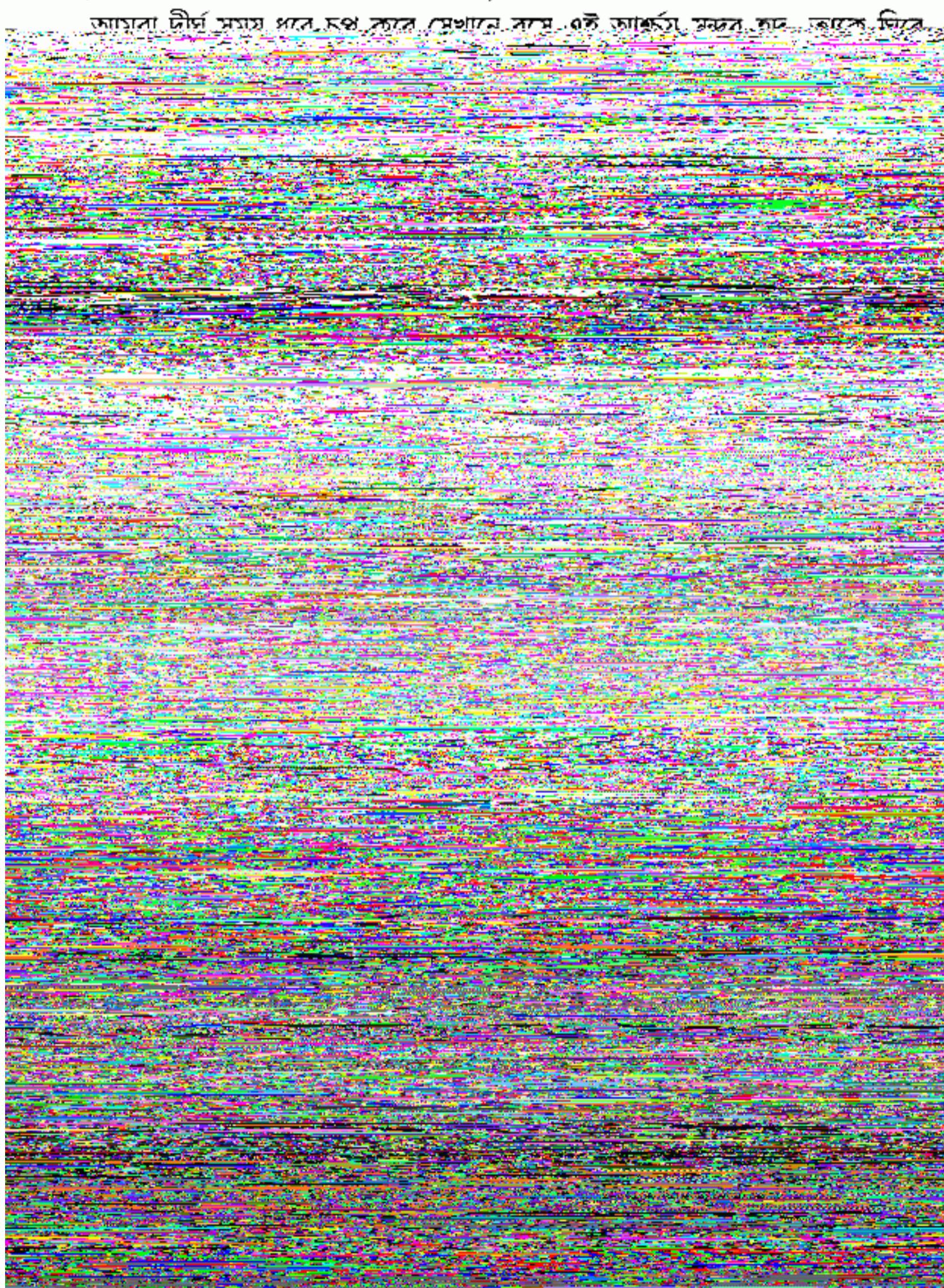
খালেদ সেটার দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, টি-রেঞ্জ! টি-রেঞ্জ! টি-রেঞ্জ! আমরা টি-রেঞ্জকে পেয়েছি।

রাজু দুহাতে মুখ চেপে ধরে রেখে ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর! ইশ! কী সুন্দর!

সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আমি স্তব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সাড়ে ছ' কোটি

বছর আগে কী প্রতাপে এই প্রাণীটি রাজত্ব করে বেড়িয়েছে। কী ভয়নক ছিল তার ক্ষমতা, কী ভয়ঙ্কর ছিল তার চেহারা, কী অচিন্ত্যনীয় ছিল তার ক্ষমতা! আজ সেই ভয়ঙ্কর টি-রেক্স পাথরে ফসিল হয়ে বন্দী হয়ে আছে? আমার বিশ্বাস হতে চায় না।

থোয়াংসা চাই চুপ করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে, মনে হয় সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।



কঙালের একটু বের হয়ে আছে। আমি একটা টেনে বের করার চেষ্টা করছিলাম, খালেদ একেবারে হা হা করে উঠল। ফসিলকে নাকি খুব ষত্রু করে ধরতে হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করে অবশ্যি বোঝা যায় এগুলো পাথর হয়ে গেছে। আমার মত দুর্বল মানুষ সেটা টেনে বের করা দূরে থাকুক একটা দাগ পর্যন্ত দিতে পারবে না।

আমরা পুরো এলাকাটা ঘূরে ঘূরে একটা রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করলাম। এত অল্প জায়গার মাঝে এত ডাইনোসোরের ফসিল কেমন করে এল, সেটা একটা রহস্য! হয়তো এখানে কোন চোরাবালি ছিল বা বিশাল কোন লুকানো খাদ ছিল, কে বলতে পারবে। সাড়ে ছ' কোটি বছর তো ছেলে খেলা নয়।

সব দেখেশুনে ছেট চাচা গন্তীর গলায় বললেন, এটা হচ্ছে আমাদের দেশের সম্পদ। বিদেশের ডাকাতেরা এসে এটা লুটেপুটে নেবে, আমি সেটা হতে দেব না। জান থাকতে হতে দেব না।

আমি মাটিতে পা দাপিয়ে বললাম, কখনো না।

রাজু বলল, কখনো না।

খালেদ বলল, নেভার! নেভার এগেন।

কি নিয়ে কথা হচ্ছে খোয়াংসা চাই ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু তার বাম দাটা মাথার ওপর দিয়ে শাঁই শাঁই করে ঘূরিয়ে একটা রণ হস্কার ছাড়ল।

রাজু বলল, বদমাইসগুলি মনে হয় সকালের আগে রওনা দেবে না।  
হ্যাঁ।

এখানে পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।  
হ্যাঁ।

রাত্রি বেলা তো জায়গাটা দেখতে পাবে না, কাজেই কিছু করতে পারবে না। তবে  
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কাজেই আমরা যা করতে চাই ভোর হওয়ার আগেই করতে হবে।

খালেদ জিজ্ঞেস করল, কি করবে ছেট চাচা?

ছেট চাচা মাথা চুলকালেন। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ভয় দেখিয়ে  
সবগুলিকে ভাগিয়ে দিতে হবে।

কিভাবে ভয় দেখাবে?

ছেট চাচা আবার তার মাথা চুলকাতে লাগলেন।

ঠিক এই সময় আমরা খোয়াংসা চাইয়ের উল্লাস ধ্বনি শুনতে পেলাম, তাকিয়ে  
দেখি সে হৃদে বসে থাকা একটা পাখিকে তীর দিয়ে গেঁথে ফেলেছে। সাদা ধৰ্বধৰে  
পাখিটা রক্তে লাল হয়ে ছটফট করছে। খোয়াংসা চাই পানিতে ছুটে গিয়ে পাখিটা তুলে  
আনে। ছেট চাচা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আহা, পাখিটাকে কেন মারল!

খোয়াংসা চাই এসে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল এই পাখিটি খেতে খুব মজা!

পাখিটা তখনো ছটফট করছে, দেখে আমাদের কারো খাওয়ার কথা মাথায় এল

না। ছেট চাচা হাত বাড়িয়ে পাখিটা নিলেন আর ঠিক তখন পাখিটা ডানা বাপটে উঠল আর এক বলক রঙে ছিটকে এসে ছেট চাচার হাতমুখ আর কাপড় লাল হয়ে উঠল। ছেট চাচা নিজের রক্তমাখা কাপড়টার দিকে কয়েক মৃহৃত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

কি আইডিয়া?

দাঢ়া বলছি। ছেট চাচা নিজের রক্তমাখা শাটটা খুলে নিচে বিছিয়ে বললেন, এই শাটটা আরো ভাল করে রক্ত দিয়ে ভেজাতে হবে।

পাখিটা কষ্ট পাচ্ছিল, তাকে এমনিতেই জবাই করে নেয়া দরকার। ছেট চাচা তার শাটের ওপর জবাই করলেন। তার এত সুন্দর শাটটা পাখির রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। ছেট চাচা তখন শাটটা পাথরে ঘষে ঘষে এখানে সেখানে ছিঁড়ে ফেললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করছ ছেট চাচা?

পাহাড়ি দানো একটা মানুষকে ধরে থেয়ে ফেলেছে। এটা তার শাট।

পাহাড়ি দানো?

হ্যাঁ।

আমরা এখানে পাহাড়ি দানোর জন্ম দেব।

কেমন করে?

বলছি শোন।

ছেট চাচা তখন তার পরিকল্পনাটা খুলে বললেন, শুনে আমরা আনন্দে লাফাতে থাকি! এরকম চমৎকার বুদ্ধি শুধু ছেট চাচার মাথা থেকেই বের হতে পারে। হাতে সময় বেশি নেই, ছেট চাচার সাথে আমরা কাজে লেগে গেলাম।

প্রথমে হুদের কাছের নরম মাটিতে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পাহাড়ি দানো নামের সেই রহস্যময় প্রাণীর পায়ের ছাপ তৈরি করলাম। চার হাত দূরে দূরে একেকটা পায়ের ছাপ, সামনে তিনটা বড় নখ, পেছনে একটা ছেট, দেখে মনে হয়, হুদের ভেতর থেকে অতিকায় একটা প্রাণী উঠে এসে হুদের পাশ দিয়ে পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেছে। কাছাকাছি রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন শাটটা রাখা হল। গাছের ডাল ভেঙে সেটা মাটিতে ঘষে ঘষে একটু ছটোপুটির মত চিহ্ন রাখা হল। দেখে কোন সন্দেহ থাকে না, হুদ থেকে একটা বিশাল দানব আকৃতির প্রাণী হেঁটে হেঁটে বের হয়ে এসে একটা মানুষকে ধরে থেয়ে ফেলে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। পায়ের ছাপের আশে পাশে আমাদের পায়ের ছাপও রয়ে গিয়েছিল, এবাবে খুব সাবধানে সেগুলি গাছের ডাল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে দেয়া হল। ছেট চাচা আমাদের বারবার বলে দিলেন, এখন থেকে খুব সাবধান, হুদের কাছাকাছি গেলে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে, যেন পায়ের ছাপ না পড়ে।

পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপ তৈরি করে ছেট চাচা আমাদের নিয়ে হুদের পাশে খাড়া পাহাড়টায় ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। সোজাসুজি ওঠা গেল না, পেছন দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক সময় নিয়ে উঠতে হল। ছেট চাচা আন্দাজ করছেন, সাহেব তার

দলের লোকগুলি নিয়ে হৃদের কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাবে। তিনি এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে চান যেটা হবে অনেক ওপরে, সহজে কেউ আসতে না পারবে না, কিন্তু সে জায়গাটা নিচে থেকে খুব সহজে দেখা যাবে। শেষ পর্যন্ত এ রকম একটা জায়গা পাওয়া গেল। একপাশে উচু পাথরের দেয়াল, মাঝখানে খানিকটা জায়গা মোটামুটি সমতল। ছোট চাচার কথা মত, আমরা সেখানে কিছু পাথরের স্তূপ দাঢ়া করলাম। বিছানার একটা চাদর ছিল, সেটাতে বড় একটা চোখ আর দাঁত আঁকা হল কাদা মাটি দিয়ে। রাতের অন্ধকারে এটা নাড়াচাড়া করলে আবছা অন্ধকারে দূর থেকে মনে হবে ভয়বাহ একটা প্রাণীর মাথা নাড়াচাড়া করছে।

পাহাড়ি দানোর গর্জন কেমন করে তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে পরিষেবণা করা হল। দুই হাতে মুখ টেকে থোয়াংসা চাই নানা ধরনের বিচিত্র শব্দ করতে পারে, সেখান থেকে বেছে বেছে একটা শব্দ ঠিক করা হল। হৃদের পাশে এই এলাকার একটা বিশেষত্ব রয়েছে। ছোট একটা শব্দ করলেও সেটা খুব চমৎকারভাবে অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যায়। মনে হয় চারপাশে পাথরের দেয়ালগুলি থেকে শব্দ প্রতিপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আসে। খুঁজে কিছু ফাঁপা ডালপালা বের করা হল, একটার সাথে আরেকটা টোকা দিলে বিচিত্র এক ধরনের শব্দ হয়, পাহাড়ি দানো ছুটে বেড়াচ্ছে বোঝানোর জন্যে এটা দিয়ে শব্দ করা হবে।

আমরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পাথর সাবধানে এমনভাবে স্তূপ করে রাখলাম যেন আস্তে টোকা দিলেই সেটা হড়মুড় করে পড়ে যায়। পাহাড়ি দানোটা যখন ছোটাছুটি করবে তখন এগুলি ধাক্কা দিয়ে ফেলে মোটামুটি একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করা হবে।

বিকেল হবার আগেই আমাদের সব প্রস্তুতি হয়ে গেল। এখন শুধু অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে আমরা আবার এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। পাথরের আড়ালে আরো নানা ধরনের ফসিল খুঁজে বের করলাম আমরা। হৃদের পাশে এক জায়গায় হঠাৎ কি একটা প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখে থোয়াংসা চাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রাণীটা কি সে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। থোয়াংসা চাই জায়গাটা ভাল করে দেখে হঠাৎ তার জিনিসপত্র নামিয়ে তার সেই ফাঁদ তৈরি করতে শুরু করল। প্রাণীটি কি আমরা জানি না কিন্তু মনে হচ্ছে সে এটা না থারে ফিরে যাবে না। আমরা থোয়াংসা চাইকে সাহায্য করলাম, যেটা একটা গাছের ডালকে খুব কায়দা করে বাঁকা করে আনা হল, একটা বড় পাথরও এবারে কোথায় জানি বেঁধে দিল, ফাঁদটা গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেয়া হল যেন দেখা না যায়। আমরা থোয়াংসা চাইয়ের ফাঁদ তৈরি করায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে, লক্ষ্যই করি নি বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। ছোট চাচা ওপর থেকে ডাক দিলেন, সবাই ওপরে চলে আস। সময় হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন জানি করে ওঠে, কি হবে আজ রাতে?

## ১১. পাহাড়ি দানো

অঙ্ককার হ্বার আগেই সাহেব আর তার দলবল এসে হাজির হল। সবার সামনে সাহেব, তার মাথায় হ্যাট, বুকে একটা কালো চশমা ঝুলছে, হাফ প্যান্ট, ভারী বুট। তার সাথে সাথে কাচু মিয়া। ঘেমে একেবারে চুপসে আছে। তাদের বেশ পেছনে অন্য লোকজন। তাদের মাথায় কাঠের খালি বাল্ল, নিশ্চয়ই এগুলিতে করে ফসিলগুলি নেবে।

লোকগুলি তাদের মাথার জিনিসগুলি নামিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়। আমরা ভোরে যখন পাহাড়ে টি-বেঞ্জের ফসিলটি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এই লোকগুলিও সেরকম হতবাক হয়ে আছে। আমরা ভয় পাই নি, কিন্তু মনে হল এই লোকগুলি বেশ ভয় পেয়েছে। পাহাড়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি কখন তারা হৃদের আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপটা দেখবে।

কিছুক্ষণের মাঝেই একজন হৃদের কাছাকাছি হেঁটে গেল। হঠাৎ সে পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপটা দেখে, সাথে সাথে সে পাথরের মত জমে গেল। একরার সামনে তাকাল, আরেকবার পেছনে তাকাল তারপর হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল। তার গলার স্বর শুনে মনে হতে থাকে পাহাড়ি দানো বুঝি তাকে তাড়া করেছে, আরেকটু হলেই তাকে খপ করে খেয়ে ফেলবে!

লোকটার চিৎকার শুনে সবাই তার কাছে ছুটে গেল, লোকটা এক নিঃশ্঵াসে কিছু একটা বলল এবং আরো কয়েকজন তার পিছু পিছু পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপ দেখতে গেল। আমরা ওপরে থেকেই বুঝতে পারি, নিচে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ফ্রেডারিক সাহেবকে গিয়ে কেউ একজন কিছু একটা বলল তখন দেখলাম সেও ছুটে গেল। পাহাড়ি দানোর পায়ের চিহ্নের পিছু পিছু কয়েকজন সাহসী মানুষ হাঁটতে থাকে আর হঠাৎ করে তারা ছোট চাচার রক্তমাখা শাটটা আবিষ্কার করে ফেলল। মানুষগুলি তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে এবং অন্য সবাই সেখানে ছুটে যায়। সবাই রক্তমাখা শাটটাকে ধিরে দাঁড়িয়ে থাকে, উন্মেজিত কথাবার্তা হতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই মানুষগুলি জটলা করতে শুরু করে।

আমরা ওপর থেকে বুঝতে পারি মানুষগুলি এখানে বাত কাটাতে সাহস পাচ্ছে না। তারা বলছে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হোক, তারা এই মুহূর্তে চলে যেতে চায়। সাহেব কাচু মিয়াকে দিয়ে তাদের জানিয়ে দিল যে সব মালপত্র আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। যদি না নেয় তাদের একটি পয়সাও দেয়া হবে না।

লোকগুলি হত দরিদ্র মানুষ। অল্প কিছু পয়সার জন্যে এখানে এসেছে, এখন এখানে থাকার সাহস নেই কিন্তু চলেও যেতে পারছে না। দেখলাম সবাই মিলে কাছাকাছি জটলা করতে থাকে। আস্তে আস্তে অঙ্ককার হয়ে গেলে লোকগুলি আগুন

জ্বালিয়ে রাম্ভাবান্না শুরু করে। আমরা ওপর থেকে শুনতে পাই পাহাড়ি দানো ছাড়া আর কিছু নিয়ে কেউ কথা বলছে না।

আমরা পাথরের আড়ালে বসে সবাইকে লক্ষ্য করতে থাকি। খাবার দাবার যা ছিল দুপুরেই শেষ হয়ে গেছে। অ্যাডভেঞ্চারে বের হলে মনে হয় খিদে বেশি পার। থোয়াংসা চাহিয়ের পাখিটা রাম্ভার কোন উপায় নেই বলে খাওয়া গেল না। এখন মনে হচ্ছে পুড়িয়েই বেশ খাওয়া যেত। আমাদের সাথে শুকনো চিড়ে ছাড়া আর কিছু নেই। বসে বসে সেটাই চিবিয়ে যাচ্ছি সবাই। চিড়ের একটা ভাল গুণ রয়েছে, অল্প একটু খেলেই খানিকক্ষণ পরে বেশ পেট ভরে যায়।

যখন রাত বেশ গভীর হয়েছে ছেট চাচা আমাদের কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন। আমি আর রাজু মিলে চাদরটা ধরে দাঢ়ালাম। মাঝামাঝি একটা চোখ আঁকা আছে, একপাশে কিছু দাঁত, আঁকা হয়েছে কাদা মাটি দিয়ে, এমন কিছু স্পষ্ট ছবি নয়। কিন্তু আবছা অঙ্ককারে অনেক দূর থেকে দেখলে এটাকে নিশ্চয়ই পাহাড়ি দানোর মাথা বলে মনে হবে। আগে থেকে ঠিক করে রাখা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আমি আর রাজু চাদরটা নাড়তে থাকি, দূর থেকে ফেন মনে হয় মাথাটা নড়ছে।

এবারে নিচের লোকগুলির দ্বষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কাজটি খুব কঠিন হবার কথা নয়। প্রথমে থোয়াংসা চাই দুহাত মুখের উপর চেপে বিকট একটা আওয়াজ করল, প্রথমে ছেট ছেট কয়েকটা ডাক তারপর লম্বা একটা ডাক। ভয়ঙ্কর সেই গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। এতুটুকু ছেলের প্লায় এরকম জোর কেমন করে হল কে জানে। নিচে যারা শুয়ে ছিল তারা সেই বিকট গর্জন শুনে লফিয়ে জেগে ওঠে। ছেট চাচা সেই সময় স্তুপ করে রাখা পাথরগুলি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন, ভয়ঙ্কর শব্দ করে সেগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে থাকে। শব্দ শুনে মনে হতে পারে, পুরো পাহাড় বুঝি মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে।

নিচে ভয়াবহ আতঙ্ক শুরু হয়ে যায়, লোকজন চিৎকার করে খোদাকে ডাকতে থাকে। আমি আর রাজু চাদরটা নাড়তে থাকি এবং হঠাৎ একজন সেটা দেখতে পার। লোকটা “পাহাড়ি দানো” “পাহাড়ি দানো” বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে।

খালেদ ফাঁপা গাছের ডালগুলি টুকে টুকে এক ধরনের শব্দ করতে থাকে, আমরা পাহাড়ি দানোর মাথা নাড়তে থাকি। থোয়াংসা চাই বিকট শব্দ করতে থাকে আর ছেট চাচা তখন আরেকটা পাথরের স্তুপ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। ভয়ঙ্কর শব্দ করে পাথর নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে, নিচের মানুষগুলি এবারে আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি কেউ কেউ এবারে ছুটতে শুরু করেছে।

আমরা এবার পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে থাকি, বিকট একটা শব্দ করে থোয়াংসা চাই আর সাথে সাথে ছেট চাচা আগে থেকে দাঁড়া করানো পাথরের স্তুপগুলো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। আমরা দুপ দাপ করে তখন আরেকটু নিচে নেমে আসি, তারপর আরো নিচে—

নিচের মানুষগুলির কাছে মনে হতে থাকে ভয়কর সেই পাহাড়ি দানো বুঝি নিচে নেমে আসছে। তারা চিৎকার করে ছোটাছুটি করতে থাকে। হৈ তৈ করে মানুষগুলি নিজের জিনিসগুলি তুলে নেয় তারপর প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। কয়েক মিনিটের মাঝে দেখতে পেলাম সব মানুষ জায়গাটা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

আমরা আনন্দে আর হাসি চাপতে পারি না। ভয় একটা বিচ্ছিন্ন জিনিস, যখন সেটা হঠাতে করে শুরু হয় সেটা কোন যুক্তিতর্ক মানে না। অমানুষিক একটা ভয় দ্রুত একজনের কাছ থেকে আরেকজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিছু বুঝার আগেই সবাই আতঙ্কে অধীর হয়ে সম্পূর্ণ অবাস্তব কাজকর্ম করে ফেলে।

আমরা খুব ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম কেউ কি তখনো রয়ে গেছে কি না, মনে হল নেই। সাহেব কাচু মিয়া সবাই প্রাণের ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে! ছোট চাচার ভয় দেখানোটা এত ভাল কাজ করবে কখনো চিন্তা করি নি। আমরা তখন পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসতে থাকি। গত রাতে ভাল ঘুম হয় নি, সাহেব তার সুন্দর তাঁবুটা ফেলে গেছে, তার ভেতরে শুয়ে খুব আরামে একটা ঘুম দেব। কাল ভোরের মাঝে নিশ্চয় পুলিশ এসে যাবে।

আমরা নিচু গলায় কথা বলতে বলতে নেমে আসছি, বড় একটা পাথর থেকে সাবধানে নিচে নেমে আসলাম তখন হঠাতে শুনলাম ‘ক্লিক’ করে একটা শব্দ হল।

কিসের শব্দ শোনার জন্যে মাথা ঘুরিয়েছি, আর সাথে সাথে তীব্র টর্চ লাইটের আলোতে চোখ ধৌধিয়ে গেল। আমি শুনতে পেলাম সাহেবটা ভারি গলায় বলছে, দুই হাত মাথার ওপরে তুলে দাঁড়াও। একটু নড়লে গুলি করে মাথার খুলি ছাতু করে দেব।

ফ্রেডারিক সাহেব কথা বলেছে ইংরেজিতে কিন্তু তবু আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধে হল না, প্রচণ্ড আতঙ্কে আমরা পাথরের মত জমে গেলাম।

## ১২. কাল রাত্রি

কি হচ্ছে বুঝতে আমাদের কিছুক্ষণ লাগল। আমরা ধরা পড়ে গেছি। চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ফ্রেডারিক সাহেব তার বন্দুকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে কাচু মিয়া। ভয়ে আতঙ্কে হঠাতে মনে হতে থাকে, আমি বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাব। অনেক কষ্ট করে তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। আড় চোখে দেখলাম আমার সামনে রাজু, এক পাশে খালেদ, পিছনে ছোট চাচা। থোয়াংসা চাহিকে দেখতে পেলাম না।

ফ্রেডারিক সাহেব আবার চিৎকার করে বলল, হ্যান্ডস আপ!

আমরা যন্ত্রের মত হাত উপরে তুললাম।

সাহেব এক হাতে বন্দুকটা ধরে রেখে অন্য হাতে সশব্দে কাচু মিয়ার গালে একটা

চড় মেরে ইংরেজিতে বলল, দেখছ তোমার পাহাড়ি দানো? দেখছ? স্টুপিড গাধা  
কোথাকার।

ফ্রেডারিক সাহেবের এরকম চড় খেয়েও কাচু মিয়া অপ্রতিভের মত হেসে বলল,  
বুঝতে পারি নাই স্যার! একেবারে বুঝতে পারি নাই।

আমাকে বুঝালে এরা ফিরে চলে গেছে। এখন তাহলে আসল কোথা থেকে? হ্যা,  
কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে?

কাচু মিয়া গালে হাত বুলাতে বুলাতে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, আমাকে  
মাঝিরা বলেছে, ওরা দেখেছে ওদের চলে যেতে। একজন বড় মানুষ আর তিনজন  
বাচ্চা। মিছা কথা বলেছিল।

এই হচ্ছে তোমার একজন বড় মানুষ আর তিনজন ছোট বাচ্চা। ভাল করে দেখে  
নাও, আর কিছুক্ষণ পরে থাকবে একটা বড় মানুষের ডেডবডি আর তিনটা বাচ্চা  
ছেলের ডেডবডি!

সাহেবের কথা শুনে আমরা ভয়ানক চমকে উঠি। রাজু ভীত মুখে একবার আমার  
দিকে তাকাল দেখলাম, তার সমস্ত মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কাচু মিয়া দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আমার হাতে ছেড়ে দেন আমি এক কোপে  
যদি এদের গলা না নামিয়ে দেই।

সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি যাও সব কুলীদের গিয়ে ডেকে  
আন।

এখন কেমন করে ডেকে আনব? এতক্ষণে সবাই তো দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

ফ্রেডারিক সাহেব মুখ লাল করে বলল, আই ডোন্ট কেয়ার। তুমি যদি গিয়ে কূলী  
যোগাড় করে না আন, তিনটা ডেডবডির জায়গায় চারটা ডেডবডি পড়ে থাকবে।

সাহেব এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দুই হাত ওপরে তুলে সামনের দিকে  
হাঁট।

আমরা দুই হাত ওপরে তুলে সামনের দিকে হাঁটতে থাকি। প্রথমে রাজু, তারপর  
আমি, আমার পর খালেদ, খালেদের পরে ছোট চাচা। খোয়াংসা চাই নেই, সাহেব  
কিংবা কাচু মিয়া তাকে খুঁজছেও না। তারা জানেও না যে, আমাদের সাথে খোয়াংসা  
চাই ছিল। সে কি একা কিছু একটা করতে পারবে?

কাচু মিয়া আমাদের পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, কত বড় বদমাইসের  
দল। বিলের নিচে যখন মাছে এসে লাশকে টুকরে টুকরে খাবে, তখন বুঝবে যজ্ঞ।  
আমার সাথে মামদোবাজি।

ফ্রেডারিক সাহেব ভারি গলায় বলল, কি বলছ?

জ্ঞে না। কিছু না।

তাবুর সামনে এসে ফ্রেডারিক সাহেব আমাদের মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল।

আমরা কোন কথা না বলে হাঁটু গেড়ে বসলাম।

সাহেব তার হাঁটুতে বন্দুকটা রেখে রাগে গরগর করতে করতে বলল, এই  
বদমায়েসী কেন করেছ?

ছোট চাচা এই প্রথম একটা কথা বললেন, বদমায়েসী কে করেছে? আমরা, না  
তোমরা?

কাচু মিয়া হঙ্কার দিয়ে বলল, চোপ!

ছোট চাচা বললেন, এটা আমাদের দেশের সম্পদ, তুমি বিদেশী মানুষ, এই সম্পদ  
চুরি করে নিতে চাও? ডাকাতি করে নিতে চাও?

কাচু মিয়া আবার হঙ্কার দিয়ে বলল, খবরদার।

ছোট চাচা বললেন, তুমি ভেবেছ তুমি পার পেয়ে যাবে? কক্ষনো না। আমি  
পুলিশকে খবর পাঠিয়েছি। তারা আসছে। কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে।

ফ্রেডারিক সাহেব হঠাৎ একটু হকচকিয়ে গেল। সপ্তশু দ্বিতীয়ে কাচু মিয়ার দিকে  
তাকাল। কাচু মিয়া মাথা নেড়ে বলল, আরে না, স্যার। পরিষ্কার মিছা কথা, ভয়  
দেখাচ্ছে।

আমরা চুপ করে বসেছিলাম, কেউ একটা কথাও বলছি না, হঠাৎ শুনলাম খালেদ  
পরিষ্কার গলায় একেবারে আমেরিকান ইংরেজিতে বলল, না ফ্রেড, এই মানুষটি মিথ্যে  
কথা বলছে না।

খালেদের ইংরেজি উচ্চারণ শুনে সাহেব একেবারে চমকে উঠল, বলল, তুমি  
এরকম ইংরেজি কোথায় শিখেছ?

আমি একজন আমেরিকান। আমার জন্ম আমেরিকায়, বড় হয়েছি আমেরিকায়,  
কথা বলি আমেরিকানদের মত, চিন্তা করি আমেরিকানদের মত। এই পোড়া দেশে  
তোমার যেরকম যন্ত্রণা হচ্ছে, আমারো সেই রকম হচ্ছে।

আমরা অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম আর সাথে সাথে বুঝে গেলাম সে  
কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছে। ফ্রেডারিক সাহেব খানিকক্ষণ খালেদের দিকে  
তাকিয়ে বলল, তুমি কি বলার চেষ্টা করছ?

আমি গত তিনদিন থেকে এই মানুষটার শক্তি খুলির ভেতরে একটা জিনিস  
তোকানোর চেষ্টা করছি। খালেদ বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট চাচাকে দেখিয়ে বলল,  
মানুষটার মাথা নিরেট পাথর।

ছোট চাচাও বুঝে গেলেন কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে। রেগে যাবার ভান করে  
বললেন, খালেদ, তুমি চুপ করবে?

খালেদ ছোট চাচাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, এই মানুষটা এই দেশের অন্য  
সব মানুষের মত মাথা খারাপ। বিষয়বুদ্ধি বলে কিছু নেই। আমি তাকে কম করে হলেও  
একশবার বলেছি, এটা জানাজানি করিয়ে লাভ নেই। ফসিলগুলি লুকিয়ে তুলে নিয়ে  
যাই, মোটা দামে বিক্রি করা যাবে, লোকটা রাজি হয় নাই।

ছোট চাচা আবার চিংকার করে বললেন, এটা আমার দেশের সম্পদ। আমি কাউকে নিতে দেব না।

খালেদ গলা নিচু করে বলল, ফ্রেড, এই মানুষটার বিচারবুদ্ধি বলে কিছু নেই, যাথাও খুব গরম। আমার মনে হয় তাকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তুমি বিশ্বাস করবে না, এই লোকটা গতকাল আমার গায়ে হাত তুলেছে। আমেরিকা হলে শিশু নির্যাতনের জন্যে ছবছর জেল হয়ে যেতো।

ফ্রেডারিক সাহেব খালেদকে ঠিক তখনো বিশ্বাস করে নি কিন্তু ছোট চাচাকে বেঁধে ফেলার বুদ্ধিটা লুকে নিল। কাচু মিয়াকে বলল, তার তাঁবুর ভেতর থেকে নাইলনের দড়ি বের করে ছোট চাচাকে বেঁধে ফেলতে।

ছোট চাচা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে খালেদের দিকে তাকিয়ে রহিলেন। খালেদ তার দৃষ্টি এড়িয়ে সাহেবকে বলল, আমি তোমার সাথে একটা ডিল করতে পারি?

কি ডিল?

আমরা আজকে সকালে এখানে এসেছি, পুরো জায়গাটা ভাল করে দেখেছি। এখানে নানা রকম ফসিল রয়েছে, সবচেয়ে চমকপ্রদ ফসিল হচ্ছে ডাইনোসোরের ডিম, একটা ভেঙে তার ভেতর থেকে বাচ্চা বের হচ্ছে। কমপ্লিট ফসিল। তুমি যদি রাজি থাক আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, তুমি তুলে নিয়ে যেতে পারবে, মিলিওন ডলারে বিক্রি হবে।

তার বদলে তুমি কি চাও?

আমাকে কয়েকটা ফসিল নিয়ে যেতে দেবে। পুলিশের কথাটা সত্যি— আজ রাতে পালাতে না পারলে আর কখনো এই ফসিল নেয়া যাব না।

ফ্রেডারিক সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে খালেদের দিকে তাকিয়ে রহিল, তখনো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

খালেদ বলল, আমাদের হাতে সময় বেশি নাই। এই একমাত্র সুযোগ।

কাচু মিয়া তখন ছোট চাচাকে মাটিতে ফেলে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। ছোট চাচা যন্ত্রণার একটা শব্দ করলেন। আমার খুব মায়া লাগল, কিন্তু কিছু করার নেই।

খালেদ আবার বলল, তোমারা দু'জন বড় মানুষ, তোমাদের কাছে বন্দুক, আর আমরা মাত্র তিনজন বাচ্চা— তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে না চাইলে নাই কিন্তু ডাইনোসোরের ডিমটা দেখে আসতে তো কোন ক্ষতি নেই। আমি চোখ বুঝে বলতে পারি, কানেগি মিউজিয়ামে সেটা এক মিলিওন ডলারে বিক্রি হবে।

সাহেব শেষ পর্যন্ত একটু নরম হল। বলল, ঠিক আছে আমাকে নিয়ে যাও। আমি না দেখে কোন কথা দিচ্ছি না।

ঠিক আছে। কিন্তু যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে আমাকে আমার পছন্দ মত কয়েকটা ফসিল নিয়ে আজ রাতের মাঝে পালিয়ে যেতে দেবে?

সাহেব খানিকক্ষণ চূপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, দেব।

চল, তাহলে যাই।

সাহেব আমাকে আর রাজুকে দেখিয়ে বলল, এরা দুজন?

এরা আমাদের সাথে যাবে, জায়গাটা দিনের বেলা দেখেছি, রাতের বেলা খুঁজে পেতে একটু ঝামেলা হতে পারে। এরা থাকলে সাহায্য করতে পারবে।

বেশ, তাহলে চল।

আমরা উঠে দাঢ়িলাম। প্রথমে খালেদ তার পিছনে রাজু তারপর আমি। আমার পিছনে সাহেব, তার হাতে বন্দুক, সাহেবের পিছনে কাচু মিয়া। দুজনের হাতে বড় দুটো টর্চ লাহুট।

খালেদের পিছু পিছু আমরা ইঁটতে থাকি আর ঠিক তখন আমি বুঝে গেলাম খালেদ কি করতে যাচ্ছে। সে সাহেবকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে খোয়াংসা চাহিয়ের ফাঁদের দিকে। কোথায় আছে খোয়াংসা চাহি? নিশ্চয় আশেপাশে কোন পাথরের আড়াল থেকে লুকিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ঠিক প্রয়োজনের সময় নিশ্চয়ই সে ঝাপিয়ে পড়বে তার রাম দা নিয়ে। আমার বুক ধৰক ধৰক করতে থাকে উজ্জেবনায়। সবকিছু হবে তো ভালভাবে? একজন ফাঁদে আটকা পড়ে গেলেও আরেকজন রয়ে যাবে, তাকে আমাদেরই সামলে নিতে হবে। পারব তো সামলে নিতে? কিছু একটা হয়ে যাবে না তো? আমি চোখ বন্ধ করে খোদাকে ডাকতে থাকি।

খালেদ গলার স্বর খুব স্বাভাবিক করে সাহেবের সাথে একটা আলোচনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাস্কেটবল খেলায় কারা এসেছে, কাদের আসা উচিত ছিল, এ ধরনের কথাবার্তা। সাহেবের কথাবার্তায় খুব একটা উৎসাহ নেই। হঁ হাঁ করে কথা শেষ করে দিচ্ছে।

আমরা খোয়াংসা চাহিয়ের ফাঁদের কাছে এসে গেছি। আর কয়েক পা গেলেই মাটিতে লুকানো দড়ির ফাঁদ। খুব সাবধানে সেটা পার হয়ে যেতে হবে। আমার বুক ধৰক ধৰক করতে থাকে, দেখলাম খালেদ একটা ছোট লাফ দিয়ে ফাঁসটা পার হল। রাজুও পার হল লাফ দিয়ে। এক জায়গায় তিনজনই লাফ দিলে সাহেব যদি কিছু সন্দেহ করে? আমি তাই না লাফিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলাম। আড়চোখে সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছি, প্রাণপণে খোদাকে ডাকছি, আর ঠিক জাদুমন্ত্রের মত ঘটল ব্যাপারটি। সাহেব পা দিল দড়ির ফাঁসে আর একেবারে বিদ্যুতের গতিতে উল্টে গেল সে। এক পা ওপরে দিয়ে ঝুলে গেল সাথে সাথে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটেছে যে, সাহেব কিছু বুঝতেই পারল না। কাচু মিয়া ভয় পেয়ে একটা চিৎকার দিল, সাথে সাথে আমরা তিনজন এক সাথে কাচু মিয়ার ওপরে ঝাপিয়ে পড়লাম। মাটিতে ফেলে গায়ের জোরে তাকে কিল ঘূষি শারছি, চেপে রেখেছি মাটিতে, উঠতে দিচ্ছি না কিছুতেই।

সাহেব উল্টো অবস্থায় ঝুলতে থাকে, তখনো সে এক হাতে টর্চ লাহুট, অন্য হাতে বন্দুকটা ধরে রেখেছে। ঝুলে থেকে ঘুরছে সে, তাই বন্দুকটা আমাদের দিকে ধরতে পারছে না। সেই অবস্থায় চিৎকার করে বলল, ছেড়ে দাও ওকে। খুন করে ফেলব না

হয়।

আমরা ছাড়লাম না কাচু মিয়াকে। আরো জ্বেরে ঠেসে ধরে রাখলাম মাটিতে।

ছেড়ে দাও। সাহেব তখনো বন্দুকটা আমাদের দিকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, পারছে না। ঠিক তখন আমরা দেখতে পেলাম, খোয়াংসা চাই তার রাম দা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার ভাষায় কি যেন বলল সে হিংস্র গলায়।

সাহেব আমাদের ছেড়ে এবার বন্দুকটা খোয়াংসা চাইয়ের দিকে ধরল। চিৎকার করে বলল, থামো, না হয় গুলি করে দেব।

খোয়াংসা চাই থামার কোন লক্ষণ দেখাল না। রাম দাটা মাথার উপর ঘুরিয়ে দাঁত কিড়িগিড় করে এগিয়ে আসতে থাকে।

সাহেব কেমন জানি ভয় পেয়ে যাব হঠাৎ, ঝুলে থেকে ভয় পাওয়া গলায় বলল, এটা কে?

আমাদের বন্দু খোয়াংসা চাই।

তাকে বল থামতে, না হলে আমি গুলি করব।

তুমি বল, আমরা তার ভাষা জানি না।

ভাষা জান না?

না।

সাহেব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বন্দুকটা খোয়াংসা চাইয়ের দিকে ধরে। চিৎকার করে বলে, গুলি করে দেব। গুলি করে দেব কিন্তু, থামছে না কেন?

খালেদ মাথা নেড়ে বলল, খোয়াংসা চাই কখনো বন্দুক দেখে নি, সে জানে না এটা কি?

গুলি করব আমি।

খালেদ চিৎকার করে বলল, তুমি উল্টো হয়ে ঝুলছো ফ্রেড। তুমি ঠিক করে গুলি করতে পারবে না। চেষ্টা করতে যেও না, খোয়াংসা চাই এক কোপে তোমার মাথা ফেলে দেবে। খোদার কসম।

আই ডেন্ট কেয়ার। সাহেব বন্দুকটা তুলে ধরে। খোয়াংসা চাই জ্বেপ না করে এগিয়ে আসে। এক পা। তারপর আরেক পা। তারপর আরেক পা। আমরা অমানুষিক আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

সমস্ত অরণ্যে যেন একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে আসে। সমস্ত পৃথিবী, গাছপালা, আকাশ বাতাস যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। আমাদের সমস্ত শরীর, সমস্ত অনুভূতি যেন অপেক্ষা করতে থাকে গুলির ভয়ঙ্কর শব্দের জন্যে, ভয়ংকর আর্তনাদের জন্যে, ভয়াবহ চরম একটা পরিষ্ণতির জন্যে।

কতক্ষণ সময় কেটেছে আমরা জানি না, মনে হতে থাকে যেন কয়েক ঘুণ। ভয়ে ভয়ে আমরা চোখ খুলে তাকাই। খোয়াংসা চাই তার রাম দাটা তখন তুলে ধরে রেখেছে

কোপ দেয়ার ভঙ্গিতে আর ঠিক তার বুকের মাঝে ফ্রেড বন্দুকটা ধরে রেখেছে। টিগারে আঙুল। একজন আরেক জনের চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কী ভয়কর, কী অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য !

খালেদ ফিসফিস করে বলল, আমার কথা শোন ফ্রেড। বন্দুকটা ফেলে দাও।

ফ্রেড তার কথা শুনল বলে মনে হল না। থোয়াংসা চাই স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের পলক পর্যন্ত ফেলাছে না। সমস্ত শরীর ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে।

খালেদ আবার বলল, বন্দুকটা ফেলে দাও ফ্রেড।

আমরা দেখতে পেলাম খুব ধীরে ধীরে ফ্রেড তার বন্দুকটা নামিয়ে আনে তারপর হাত থেকে নিচে ফেলে দেয়। হেরে গেছে সে। হেরে গেছে একটা পাহাড়ি শিশুর সাহসের কাছে।

আমাদের বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে।

ছেট চাচার হাত পিছন দিকে শক্ত করে বেঁধে কাচু মিয়া তাকে উপুড় করে ফেলে রেখেছিল। ছেট চাচা অনেক কষ্ট করে সোজা হয়ে বসেছেন। সেই অবস্থায় যখন আমাদেরকে আসতে দেখলেন এত অবাক হলেন বলার মত নয়, তাকে অবাক করে দেয়ার জন্যে আমরা ব্যাপারটা করেছিও অনেক চমকপ্রদ। কাচু মিয়া এবং ফ্রেড দুজনের হাত পিছনে বাঁধা, দড়ি ধরে কাচু মিয়ার পিছনে রাজু, ফ্রেডের পিছনে খালেদ, সামনে থোয়াংসা চাই, তার ঘাড়ে বিশাল রাম দা। আমি সবার পেছনে, আমার হাতে বন্দুক। থোয়াংসা চাইয়ের হাতে একটা টর্চ লাইট, আমার হাতে আরেকটা। আমরা গান গাইতে গাইতে আসছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি গানটা তৈরি হয়েছে তাই খুব উচু দরের শিল্পকর্ম হয় নি। কিন্তু গভীর রাতে এই জঙ্গলের মাঝে মেটি চমৎকার শোনাচ্ছিল। গানটা এরকমের—

প্রথমে আমি বলি :

কাচু মিয়া ফ্রেডি মিয়া দুই শয়তান —

তখন অন্য সবাই বলে : দুই শয়তান।

আমি আবার বলি :

ধরে আনি পিছ মোড়া ডান বাম ডান।

অন্য সবাই তখন মাটিতে পা দাপিয়ে বলে :

ডান বাম ডান

ডান বাম ডান।

তখন থোয়াংসা চাই তার রাম দা ঘুরিয়ে এক পাক নেচে মুখে হাত দিয়ে বলে :

হয়া হয়া হয়া হয়া।

আমরা সবাই বলি : ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং।

তারপর আমরা সবাই লাক্ষিয়ে বিকট স্বরে ঘ্যাং ঘ্যাং করতে থাকি।

যদি আমরা এমনি এমনি চলে আসতাম, তাহলে বেশি দেরি হত না কিন্তু এই গান্টার কারণে আমাদের পৌছাতে একটু দেরি হল। আমাদের দেখে ছোট চাচার মুখের যা একটা অবস্থা হল সেটা দেখাব মত। দুই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে একেবারে গোল আলুর মত, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মুখ দিয়ে কেন কথা বের হচ্ছে না। শুধু বলছেন, তো- তো- তো- তোরা- তোরা- তোরা-

আমি বললাম, হ্যাঁ, চাচা, আমেরা !

থোয়াংসা চাই ছুটে গিয়ে রাম দা দিয়ে ঘ্যাঁচ করে ছোট চাচার বাঁধন কেটে দিল।  
তারপর মুখে হাত দিয়ে বলল, হয়া হয়া হয়া।

আমরা সবাই বললাম, ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং !

### ১৩. শেষ কথা

মুসলিম ভাই পুলিশকে নিয়ে হাজির হল পরের দিন দুপুর বেলা। আমরা ততক্ষণে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। রাতে খুব ভাল ঘুম হয় নি, হওয়ার কথাও নয়। এত উত্তেজনার মাঝে ঘুম আসতে চায় না। ফ্রেড আর কাচু মিয়াকে পাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সারা রাত একজন না হয় আরেকজন পাহারা দিয়েছে। ছোট চাচা পর্যন্ত জেগেছিলেন যখন তার পাহারা দেবার কথা। কাচু মিয়া আর ফ্রেড অবশ্যি কোন রকম বামেলা করেনি। ফ্রেড প্রথম দিকে আমাদের সাথে কথা বলছিল, তাকে ছেড়ে দিলে সে কত টাকা দিবে, এ ধরনের কথা। ছোট চাচা তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি পুঁজিবাদী দেশের মানুষ, মনে কর টাকা দিয়ে সব হয়। তোমার দেশে হয়তো হয় কিন্তু এখানে হয় না।

ফ্রেড বলল, তোমার টাকার দরকার নেই?

আছে, কিন্তু টাকার লোভ নেই।

ফ্রেড আর কোন কথা বলল না। ছোট চাচা না হয়ে যদি বড় চাচা হতেন তাহলেই সর্বনাশ হত !

পুলিশ অফিসার কাচু মিয়াকে এভাবে বেঁধে রেখেছি দেখে খুব শুশি হলেন।  
বললেন, এইবার পেয়েছি ব্যাটাকে। জম্মের মত সিধে করে দেব।

অনেক খুনখারাপি করেছে, প্রমাণের অভাবে নাকি সবসময় ছাড়া পেয়ে যায়।  
এবাবে আর ছাড়াছাড়ি নেই। ফ্রেডকে নিয়ে অবিশ্যি পুলিশ অফিসার খুব আশাবাদী নন। যাথা নেড়ে বললেন, খবর পৌছানো মাত্র ওপর থেকে টেলিফোন আসবে, তখন ছেড়ে দিতে হবে।

ছোট চাচা বললেন, কোন সমস্যা নেই। ঢাকায় গিয়ে সব খবরের কাগজে

এমনভাবে খবরটা ছাপানো হবে যে, কারো বাবার সাধ্য হবে না তাকে জড়িয়ে নেয়।  
পুলিশ ভদ্রলোক অবশ্য তবু মাথা নেড়ে বললেন, এই সাদা চামড়ার লোকের কিছু হয়  
না। দেশের পর দেশ জ্বালিয়ে দেয় তবু কিছু হয় না!

ছেট চাচা বললেন, এই ফসিলগুলির কিছু হবে না তো?

পুলিশ অফিসার বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, দেশের সম্পদ। আমরা জান  
দিয়ে রক্ষা করব। ফিরে গিয়েই আমি রিপোর্ট পাঠাইছি হেড অফিসে।

আমাদের ফিরে আসতে আসতে আরো দু'দিন কেটে গেল। সাঞ্চু নদীতে নৌকা  
ভাসিয়ে মুসলিম ভাই আমাদের ফিরিয়ে আনল। খোয়াংসা চাইকে নামিয়ে দেয়া হল  
তার পাহাড়ে। আমাদের বিশ্বাসহ হতে চাইছিল না তাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব।  
নৌকা থেকে নেমে খোয়াংসা চাই আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা  
করে কিছু একটা বলল। আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। খালেদ তার হাত ধরে বলল,  
খোয়াংসা চাই, আবার দেখা হবে।

আমি বললাম, তুমি আমাদের প্রাণের বন্ধু।

রাজুর মনটা খুব নরম। সে খোয়াংসা চাইকে জড়িয়ে ধরে একেবারে ছে ছে করে  
কেঁদে ফেলল। আর তাকে কাঁদতে দেখে আমরাও কেঁদে ফেললাম। আর আমাদের  
কাঁদতে দেখে খোয়াংসা চাইও ঠোট কামড়ে কাঁদতে শুরু করল।

ছেট চাচা বললেন, ছিঃ কাঁদে না। আবার আমাদের দেখা হবে। আমরা আবার  
আসব।

মুসলিম ভাই বলল, এসে আমাকে খোঁজ করবেন। আমি এই পাহাড়ে এসে  
খোয়াংসা চাইকে বের করব।

খালেদ বলল, হ্যাঁ, আবার আসব। বাবা বলেছে, আমরা আমেরিকা থেকে দেশে  
ফিরে আসব। এই পাহাড়েই থাকব আমরা!

খোয়াংসা চাই কিছু বলল না। এগিয়ে এসে প্রথমে আমাকে, তারপর খালেদকে,  
তারপর রাজুকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল।  
যতক্ষণ না সে ঘন অরণ্যে অদৃশ্য না হয়ে গেল আমরা তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।  
চোখের পানিতে তখন বনজঙ্গল পাহাড় সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, খোয়াংসা চাই থাকলেও  
তাকে দেখতে পেতাম না।

ফসিলের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক হৈ তৈ হয়েছিল। খালেদের তোলা ছবিগুলো দিয়ে  
খবরের কাগজে বড় বড় লেখা বের হয়েছিল। প্রথম প্রথম সাংবাদিকেরা এসে  
আমাদের সাথে কথা বলেছে, আমাদের ছবিও কোথায় কোথায় ছাপা হয়েছে। খালেদ  
আমেরিকা গিয়ে নাকি কংগ্রেসম্যানদের কাছে ফ্রেডের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে।  
সেখানেও নাকি সেটা নিয়ে খানিকটা হৈ তৈ হয়েছে। হীরা চাচা চিঠি লিখে জানিয়েছেন,

অনেকদিন দেশের বাইরে থাকা হল। এখন দেশে ফিরে আসতে চান। খালেদকে নিয়েই তার একটু ভয় ছিল, এখন তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। আমরা খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। কে জানে হীরা চাচাকে দেখে হয়তো বড় চাচা, জয়নাল চাচা আর সুন্দর চাচা একটু ঘানুষ হবেন! আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনে তারা যা একটা কাণ্ড করলেন সেটা আর বলার নয়।

সেই রহস্যময় পাহাড় থেকে ফসিল তুলে আনা শুরু হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম টি-রেঞ্জের ফসিল, কিন্তু এটার ঠিক নাম হচ্ছে টাৰ্বোসোৱাস। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, টি-রেঞ্জের কাছাকাছি এক ধরনের ডাইনোসোর। ফসিলগুলি রাখার জন্যে যাদুঘরে একটা আলাদা বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয় নি। আমরা একদিন দেখতে গিয়েছিলাম, কোন মানুষজন নেই দেখে দরজার ফাঁক দিয়ে আমি আর রাজু ঢুকে গেলাম। শক্ত কংক্রিটের একটা টেবিলে একটা ডাইনোসোরের মাথা রাখা আছে। কী ভয়ঙ্কর তার মুখ! আমি একটু হাত দিয়ে হুঁয়ে দেখছি, হঠাৎ পিছন থেকে একজন খপ করে আমাদের ঘাড় ধরে ফেলল। আমরা তাকিয়ে দেখি একজন বয়স্ক মানুষ, চোখ পাকিয়ে চিংকাব করে বলল, কি করছ এখানে, হাঁ? দেখছি।

এটা কি রঙ তামাশার জিনিস? জান এটা কি? জান? আমি কিছু বলার আগেই লোকটা গর্জন করে বলল, জান এটা কোথা থেকে এসেছে? জান? দেশের কৃত বড় সম্পদ তুমি জান? জান?

আমি আবার কিছু বলার আগেই লোকটা আমাদের ঘাড় ধরে ঠেলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে থাকে, বাইরে ঠেলে দিয়ে বলে, আর কখনো যেন তোমাদের না দেখি এখানে। দুষ্টু ছেলে।

আমরা খুব অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আর এমন রাগ উঠল বলার মত নয়। লোকটা দরজা বন্ধ করতে করতে থেমে গিয়ে বলল, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলার আছে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আছে। কি?

আমি দুই হাত মুখে ধরে বললাম, হয়া হয়া হয়া হয়া!

রাজুর এক সেকেন্ড সময় লাগল বুঝতে, যেই বুঝতে পারল তখন দুই হাত ওপরে তুলে লাফাতে লাফাতে বলল, ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং!

কি হচ্ছে? কী হচ্ছে এটা?

আমি বললাম, টি-রেঞ্জেকে জিজ্ঞেস করে দেখেন। সে জানে।

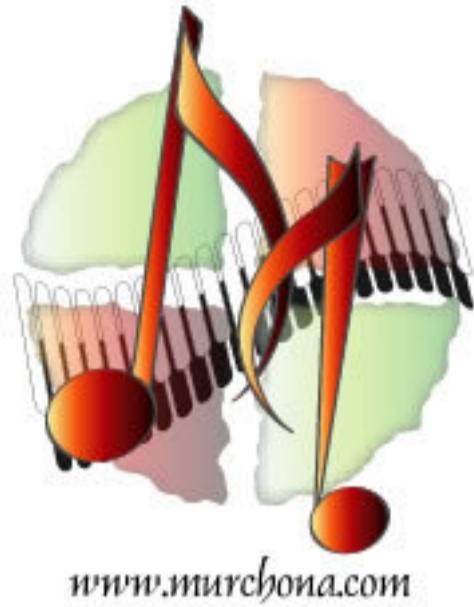
লোকটা খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

## লেখকের কথা

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমরা বান্দরবন থাকতাম। বান্দরবন খুব সুন্দর জায়গা। ছোট বেলায় সেটিকে যে কী রহস্যময় মনে হত, কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। আমার বাবা সেখানে পুলিশে চাকুরি করতেন। আরাকান থেকে সেখানে ডাকাতেরা আসত আর আমার বাবাকে নৌকা করে পাহাড়ে যেতে হত তাদের সাথে মুখোমুখি হবার জন্য। বাবা এসে আমাদের সেই রহস্যময় পাহাড়ের গল্প করতেন, আমরা অবাক হয়ে শুনতাম। বান্দরবন স্কুলে আমার অনেক উপজাতীয় বন্ধু ছিল, একটি মগ বাচ্চা ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, তার নাম ছিল থোয়াংসা চাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বাবাকে পাকিস্তান মিলেটারিয়া মেরে ফেলেছিল। বান্দরবনের সেই রহস্যময় এলাকা নিয়ে আমার বাবার যত লেখালেখি ছিল সব তখন হারিয়ে গেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে সব সময় আমি ভাবতাম, আমার বাবা যেখানে গিয়েছিলেন সেই পাহাড়ে একদিন আমি বেড়াতে যাব। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন দুজন বন্ধুকে নিয়ে সত্য একবার সেই রহস্যময় এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। একজন মাঝি নৌকা করে আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। নৌকায় থাকা, নৌকায় খাওয়া, অঙ্ককার নেমে এলে নৌকাতে ঘূম। কী চমৎকার ছিল সেই রহস্যময় পাহাড়, সেই বন, সেই নদী, সেই উপজাতীয় মানুষ। আর কী চমৎকার রান্না করত সেই হাসিখুশি মাঝি। সেই মাঝির নাম ছিল মুসলিম, আমরা তাকে ডাকতাম মুসলিম ভাই।

এই বইয়ের সমস্ত চরিত্র, সমস্ত ঘটনা কাল্পনিক। শুধু শুধু দুটি নাম, ‘থোয়াংসা চাই’ আর ‘মুসলিম ভাই’ কাল্পনিক নয়। নাম দুটি সত্য।



## **T-Rax Er Sondhane by Md. Jafar Iqbal**



**For More Books & Music Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)**  
**MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>**  
[suman\\_ahm@yahoo.com](mailto:suman_ahm@yahoo.com)